বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

নবম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

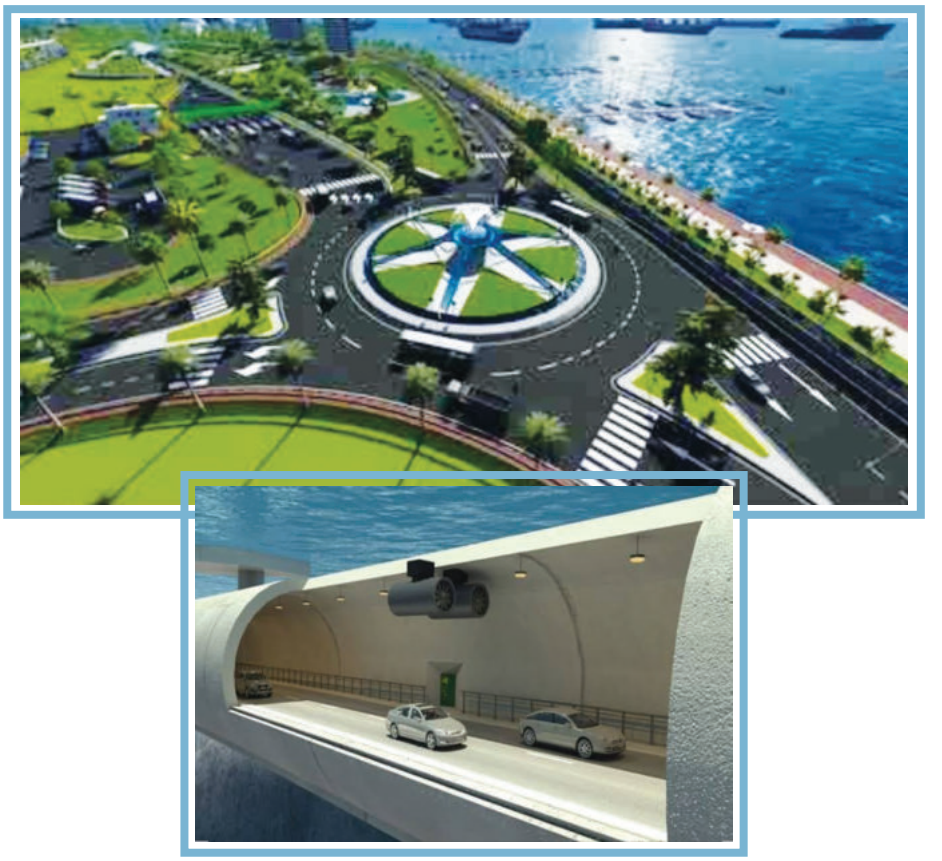

কর্ণফুলী টানেল, চট্টগ্রাম

কর্ণফুলী টানেল কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে ৪ লেন বিশিষ্ট সড়ক টানেল। টানেলটি কর্ণফুলী নদীর দুই তীরের অঞ্চলকে সুড়ঙ্গ পথে যুক্ত করবে। এই টানেলে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক যুক্ত হবে। টানেলের দৈর্ঘ্য ৩.৪৩ কিলোমিটার। এটিই বাংলাদেশের প্রথম সুড়ঙ্গ পথ। যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজীকরণ, আধুনিকায়ন, শিল্প কারখানার বিকাশ সাধন এবং পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের ফলে কর্ণফুলী টানেল বেকারত্ব দূরীকরণসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

নবম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

ড. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া

ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া

ড. অরূপ কুমার বড়ুয়া

ড. অর্থদর্শী বড়ুয়া

অশোক কুমার চাকমা

বরুণ তালুকদার

মার্জিয়া খাতান স্মিতা

এ এফ এম সারোয়ার জাহান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২৩

শিল্পনির্দেশনা
মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ
মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ
বিভোল সাহা
ফাইয়াজ রাফিদ

গ্রাফিক্স
নূর-ই-ইলাহী
কে. এম. ইউসুফ আলী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বিষয় পরিচিতি

প্রিয় শিক্ষার্থী

নাম _____

বিদ্যালয় _____

তোমাকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। এই নতুন বইয়ের মাধ্যমে তুমি বেশ কিছু সুন্দর ও মজার অভিজ্ঞতা পাবে। অভিজ্ঞতা পাওয়ার সময় কখনো বন্ধু, কখনো বাবা-মা, কখনো পরিবারের সদস্য, কখনো সহপাঠী বা শিক্ষক তোমার সহযোগী হবেন। কখনো একা একাও অভিজ্ঞতাগুলো লাভ করবে। তখন এই বই হবে তোমার একমাত্র বন্ধু।

তুমি যে অভিজ্ঞতা পাবে এবং যা জানবে, তা এই বইয়ে লিখে রাখতে ভুলবে না কিন্তু! তা হলেই এই বই হতে পারে তোমার তৈরি রিসোর্স বই।

শুভ কামনা রইল।

সূচিপত্র

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব	১ - ১০
বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের আচরণবিধি	১১ - ২৫
প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা	২৬ - ৪১
পারমী	৪২ - ৫৬
অভিধর্ম পিটক	৫৭ - ৬৬
বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস	৬৭ - ৮৩
বৌদ্ধধর্মে সহমর্মিতা	৮৪ - ৯৭
শব্দকোষ	৯৮ - ৯৯

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব

এ অধ্যায় থেকে আমরা জানতে পারব—

- বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পরিচয়;
- বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের প্রকারভেদ;
- বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের গুণাবলির পরিচয়;
- বোধিসত্ত্বের গুরুত্ব।

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব শব্দ দুটি খুবই পরিপূরক। একটির সঙ্গে অপরটির রয়েছে ঘনিষ্ঠ সংযোগ। 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ জ্ঞানী আর 'বোধি' শব্দের অর্থ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। তবে এর উৎপত্তি বা বিবর্তনের পথ সহজ নয়। বোধিসত্ত্ব হিসেবে শতশত বছরের একাগ্র সাধনা ও কঠোর অধ্যাবসায়ের ফলে বুদ্ধত্ব অর্জন সম্ভব। এখানে বুদ্ধ বলতে শুধু গৌতম বুদ্ধ নয়। বুদ্ধের সাধারণ আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হচ্ছে। বৌদ্ধ বিশ্বাস অনুযায়ী গৌতম বুদ্ধের আগে আরও অনেক বুদ্ধ ছিলেন। সে হিসেবে বোধিসত্ত্বের সংখ্যাও অপরিমেয়। তবে উভয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের আদর্শিক গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য প্রায় একই। নিচে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পরিচয় দেওয়া হলো:

বুদ্ধ-পরিচিতি

বুদ্ধ শব্দের সরল অর্থ জ্ঞানী হলেও এ জ্ঞান কেবল সাধারণ বা জাগতিক নয়, তা পারমার্থিক জ্ঞানও বটে। যেমন: জাতিস্মর বা পরচিত্ত জ্ঞানও এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি নিজের ও অন্যের জন্মবৃত্তান্ত যেমন জানেন, তেমনি অন্যের মনের কথাও জানতে পারেন। তাই তিনি কখন, কাকে কীভাবে উপদেশ দেবেন, তা তিনি সম্যকভাবে বুঝতে পারেন। তাই পৃথিবীতে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি থাকলেও তাঁরা বুদ্ধ হিসেবে অভিহিত নন। এ জ্ঞান অতুলনীয় অনন্য ও অসাধারণ। জাগতিক সব তৃষ্ণার বিনাশ ঘটিয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানসাধনায় পূর্ণতা পেলেই বুদ্ধ হিসেবে অভিহিত হতে পারেন।

জগতে বুদ্ধের আবির্ভাব অত্যন্ত দুর্লভ। বৌদ্ধ বিশ্বাসমতে– একজন বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে আরেকজন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে। এর মাঝখানে পূর্ববর্তী বুদ্ধের অনুশাসন চলে। এ ধারায় বর্তমানে বৌদ্ধরা গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা অনুশীলন করছে।

মূলত বুদ্ধত্ব অর্জনের সাধনা দীর্ঘ পথপরিক্রমার মতো। এটিকে বলা চলে পারমী পূর্ণতার পরিক্রমা। বিভিন্ন প্রকার পারমী পূরণের জন্য প্রয়োজন জন্মজন্মান্তরের অসংখ্য কুশল কর্মের প্রভাব। লক্ষণীয় এই জন্ম কেবল মানুষ নয়, অন্যান্য প্রাণী হিসেবেও জন্ম নিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করতে হয়। স্মর্তব্য, পূর্বের শ্রেণিতে পঠিত জাতকের বিভিন্ন কাহিনিতে সে সব পুণ্যকর্মের কিছু নিদর্শন রয়েছে। এভাবে পারমী পূর্ণ করে বহু বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন, ভবিষ্যতেও হবেন।

বুদ্ধের প্রকারভেদ

বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থে তিন প্রকার বুদ্ধের উল্লেখ দেখা যায়। যথা:

১. সম্মাসম্বুদ্ধ বা সম্যকসম্বুদ্ধ

২. পচ্চেকবুদ্ধ বা প্রত্যেকবুদ্ধ

৩. সাবকবুদ্ধ বা শ্রাবকবুদ্ধ

১. সম্মাসম্বুদ্ধ বা সম্যকসম্বুদ্ধ: জগতে বুদ্ধগণের মধ্যে সম্যকসম্বুদ্ধই সর্বোত্তম। যিনি কোনো গুরুর সাহায্য ছাড়া জন্মজন্মান্তরের সাধনায় দশ পারমী পূর্ণ করে নিজের কর্মপ্রচেষ্টায় বুদ্ধত্বজ্ঞান লাভ করেন। তিনি সর্বোত্তম প্রজ্ঞাজ্ঞানের অধিকারী। পূর্বের জন্মের সুকর্মের প্রভাবে সর্বজ্ঞতা অর্জন করে বুদ্ধ হন। তাঁরা শুধু নিজের মুক্তির জন্য বুদ্ধ হন না, জগতের সকল প্রাণীর মুক্তির ব্রত নিয়েই বুদ্ধ হন। এজন্য সকল প্রাণীর কল্যাণে তাঁরা দুঃখমুক্তির পথ ও নির্বাণ লাভের উপায়ে তাঁরা এই মুক্তির বাণী প্রচার করেন।

জগতে বুদ্ধগণের আবির্ভাব দুর্লভ। এর মধ্যে সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব অতীব দুর্লভ। পৃথিবীতে একজন বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর হাজার বছর সাধনা করে আরেকজন সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে। ত্রিপিটকে এ পর্যন্ত আটাশজন সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবের কথা জানা যায়।

২. পচ্চেকবুদ্ধ বা প্রত্যেকবুদ্ধ: প্রত্যেকবুদ্ধ হলো- যাঁরা স্বীয় কর্মপ্রচেষ্টায় আত্মমুক্তির সাধনায় পূর্ণতা অর্জনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বুদ্ধগণ সকল তৃষ্ণা ক্ষয় করার জন্য সম্যকসম্বুদ্ধের সাধনপ্রণালি অনুকরণ করে বুদ্ধ হন। সম্যকসম্বুদ্ধের মতো তাঁরাও স্বীয় সাধনাবলে অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তবে এ বুদ্ধগণ সকল প্রাণীর মুক্তির চিন্তা করে না, শুধু নিজের মুক্তির পথ অনুশীলনে সীমাবদ্ধ। বুদ্ধগণ কোনো একটা সময়ে পৃথিবীতে সম্যকসম্বুদ্ধ হয়ে আবির্ভূত হবেন। তাই তাঁরা অনুগামীবুদ্ধ হয়ে পৃথিবীতে পারমী পূরণে নীরবে প্রজ্ঞাসাধনায় রত থাকেন।

৩. সাবকবুদ্ধ বা শ্রাবকবুদ্ধ: শ্রাবকবুদ্ধ হলো সম্যকসম্বুদ্ধ আদর্শ অনুশীলনের সাধনায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা। শ্রাবকবুদ্ধগণই ভবিষ্যতে সম্যকসম্বুদ্ধ হবেন। এভাবে তাঁরা মুক্তিসাধনায় রত থাকেন। প্রকৃতপক্ষে সম্যকসম্বুদ্ধের অনুসারী অনেক শিষ্য প্রশিষ্যরা শ্রাবকবুদ্ধ হিসেবে পারমী পূরণে রত থেকে মুক্তিসাধনায় ব্রতী হন। তাঁরা পৃথিবীতে মানবকল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত রাখেন এবং অন্যদেরকেও নির্বাণ লাভে সহায়তা করেন। প্রত্যেক সম্যকসম্বুদ্ধের অনেক শিষ্য-প্রশিষ্য থাকেন, যাঁরা অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত। শ্রাবকবুদ্ধগণ নির্বাণের অভিযাত্রী হয়ে নিজের কর্মপ্রচেষ্টায় সাধনায় মুক্তি লাভ করেন। তাঁরা পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করে দুঃখভোগ করেন না। গৌতম বুদ্ধের সময়ে অনেকে শ্রাবকবুদ্ধ হয়ে বুদ্ধের আদর্শ অনুশীলনে রত ছিলেন। তাঁরা বুদ্ধ হওয়ার ব্রত নিয়ে পারমী পূরণ করেন। তাঁদের মধ্যে অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন অন্যতম। এ ছাড়াও মহাকশ্যপ, বিনয়ধর উপালী, ধর্মভাণ্ডারিক আনন্দ, লাভীশ্রেষ্ঠ সীবলী স্থবির প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বুদ্ধের গুণাবলি

জগতে বুদ্ধের গুণ অনন্ত। এই গুণগুলো পূরণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্যই বুদ্ধের গুণ অচিন্তনীয়।

১. তিনি অর্হৎ: যিনি অন্তরে ও বাইরে পাপমুক্ত মহাপুরুষ। যিনি লোভ, দ্বেষ, মোহ, অহংকার, অজ্ঞানতা, মিথ্যাদৃষ্টি ও শত্রুকে দমন করেছেন। যিনি পুনর্জন্মের কারণ ধ্বংস করতে পেরেছেন বলে পুনরায় তাঁকে আর দুঃখভোগ করতে হবে না। এজন্য তিনি অর্হত্ব।

২. তিনি সম্যকসম্বুদ্ধ: যিনি সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী মহাপুরুষ। জগতে সকল বিষয়ে জ্ঞাত। তিনি নিজের ও পরের কল্যাণের কথা চিন্তা করেন এবং নির্বাণ লাভে সহযোগিতা করেন।

৩. তিনি বিদ্যা ও আচরণসম্পন্ন: যিনি সকল বিদ্যা ও সু-আচরণসম্পন্ন। বিদর্শন জ্ঞান, ঋদ্ধিশক্তি, দিব্যশক্তি, মনোময় ঋদ্ধিশক্তি, পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান, পূর্বজন্ম সম্পর্কে জ্ঞাত, চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান, কাম তৃষ্ণাক্ষয় জ্ঞান- এই অষ্টবিধ বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞাত। শীল, আহারমাত্রা জ্ঞান, লজ্জা, ইন্দ্রিয় সংযম, সর্বদা আত্মরক্ষা জ্ঞান, শ্রদ্ধা, পাপভয়, স্মৃতি, শ্রুতি, প্রজ্ঞা, উৎসাহ ও চতুর্বিধ ধ্যান প্রভৃতি আচরণে সম্পন্ন।

৪. তিনি সুগত: যিনি নির্বাণে সুপথে বা সুন্দরভাবে গমন করেছেন বলে সুগত।

৫. তিনি লোকবিধ: স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল— এই ত্রিলোক সম্পর্কে সম্যকজ্ঞানসম্পন্ন।

৬. তিনি অনুত্তর: যিনি অনন্ত গুণের আধার। তাঁর গুণে অন্য কোনো ব্যক্তি সমকক্ষ ছিলেন না বলে তিনি শ্রেষ্ঠ। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাগুণে পারদর্শিতায় সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত।

৭. তিনি পরুষ দমনকারী: যিনি তাঁর ত্যাগদীপ্ত গুণমহিমায় সকল অশুভ শক্তিকে দমন করতে সক্ষম হয়েছেন বলে তিনি পুরিসদম্ম সারথি।

৮. তিনি দেব মানুষের শাস্তা: যিনি পরম সত্যজ্ঞান দ্বারা সকলকে জয় করেছেন বলে তিনি দেব ও মনুষ্যগণের শাস্তা ও পথপ্রদর্শক।

৯. তিনি বুদ্ধভগবান: যিনি সকল রাগ, দ্বেষ ও মোহকে বিনাশ বা ধ্বংস করে সর্ববিধ পারমী পূরণ করে জগতের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ হয়েছেন। সেই সমুদয় প্রজ্ঞাজ্ঞানের আধার বলে তিনি ভগবান।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ১

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমার সবচেয়ে পছন্দের ব্যক্তির নাম ও পরিচয় লেখো

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২

তোমার ও তোমার সবচেয়ে পছন্দের ব্যক্তির গুণাবলি চিন্তা করে লিখে ফেলো এবং তোমার সহপাঠীদের সঙ্গে বিনিময় করো।

তোমার গুণাবলি	তোমার সবচেয়ে পছন্দের ব্যক্তির গুণাবলি

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

বোধিসত্ত্বের পরিচয়

'বোধি' শব্দের অর্থ পরম জ্ঞান বা সত্য। বোধ বা জ্ঞান শব্দ থেকেই বোধি শব্দের উৎপত্তি। 'বোধি' ও 'সত্ত্ব' এ দুটি শব্দের সমন্বয়ে বোধিসত্ত্বের উদ্ভব। বোধি শব্দের অর্থ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা, আর সত্ত্ব শব্দের অর্থ হলো প্রাণী বা জীব। বোধি বা জ্ঞান সাধনে যিনি সাধক, সেই ব্যক্তি বা সত্ত্বই বোধিসত্ত্ব নামে অভিহিত। যিনি বোধি বা বুদ্ধত্ব জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে জন্মজন্মান্তরে দশ পারমীর পরিপূর্ণতা সাধন করেন, তাকে বোধিসত্ত্ব বলা হয়। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত বোধিসত্ত্ব হিসেবে সমাদৃত। বোধিসত্ত্ব পারমীর মূল উদ্দেশ্য বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভের জন্য লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা। বুদ্ধত্ব জ্ঞানলাভের জন্য বোধিসত্ত্ব পারমী পূর্ণ করতে। পারমী পূরণরত বোধিসত্ত্বকে বলা হয় বুদ্ধাঙ্কুর। বোধিসত্ত্ব পারমী পূর্ণতা লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। বহু জন্মজন্মান্তর পারমী তথা কুশল কর্মের ফলে জগতে বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হয়। বোধিসত্ত্ব পারমীর পূর্ণতা অর্জিত হয় বুদ্ধত্ব লাভের মাধ্যমে। জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া বিবেচনায় বোধিসত্ত্ব তিন প্রকার;

যেমন–

ক) শ্রাবক বোধিসত্ত্ব

খ) প্রত্যেক বোধিসত্ত্ব

গ) সম্যক বোধিসত্ত্ব

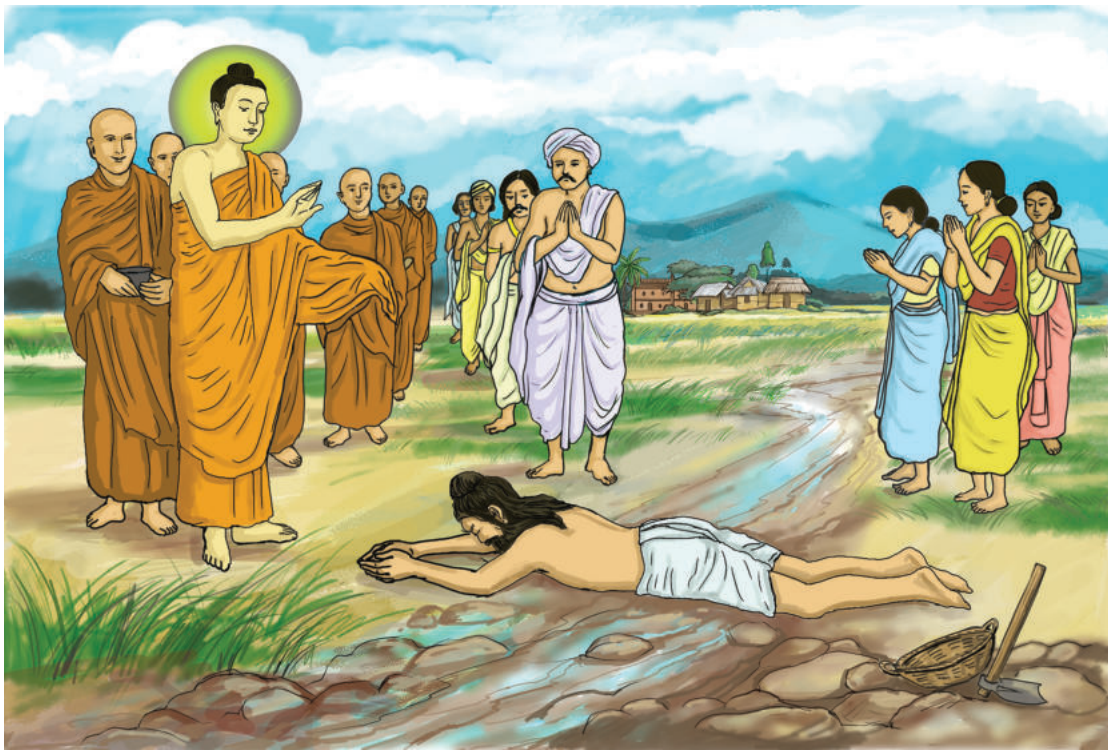

গৌতম বুদ্ধ তাঁর পূর্ব জন্মের বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দীপঙ্কর বুদ্ধের কাছে বুদ্ধত্ব প্রার্থনা করছেন

ক) শ্রাবক বোধিসত্ত্ব: শ্রাবক, বোধি এবং সত্ত্ব এই তিন শব্দের সমন্বয়ে শ্রাবক বোধিসত্ত্ব গঠিত। এখানে শ্রাবক অর্থ শ্রবণ, বোধি শব্দের অর্থ জ্ঞান আর সত্ত্ব শব্দের অর্থ জীব। বোধিসত্ত্ব পারমী পূরণে শ্রবণের মাধ্যমে বুদ্ধের যে শিষ্য-প্রশিষ্যগণ সাধনায় রত হয়ে জ্ঞান অর্জন করেন, তাঁদের শ্রাবক বোধিসত্ত্ব বলে। বুদ্ধের সময়ে সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন প্রমুখ শ্রাবক বোধিসত্ত্ব হিসেবে আখ্যায়িত।

খ) প্রত্যেক বোধিসত্ত্ব: গুরুর সান্নিধ্য ছাড়া স্বাধীনভাবে নিজস্ব প্রচেষ্টায় বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভের সাধনায় রত হওয়াকে প্রত্যেক বোধিসত্ত্ব বলে। প্রত্যেক বোধিসত্ত্ব প্রজ্ঞাগুণে নিজে প্রতিষ্ঠিত হলেও তাঁর গুণমহিমার প্রভাব অন্যকে প্রভাবিত করতে পারে না। বুদ্ধের সময়ে অনেক শিষ্য এই গুণমহিমায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

গ) সম্যক বোধিসত্ত্ব: এটি বোধিসত্ত্ব পারমী পূর্ণতার সর্বশেষ প্রক্রিয়া বিশেষ। সকলের কল্যাণে বোধিজ্ঞান লাভের সাধনায় অনুসরণকারীকে সম্যক বোধিসত্ত্ব বলে। এই সাধনায় বোধিচিত্তে জ্ঞানে পূর্ণতা অর্জন করতে পারলে সম্যক সম্বুদ্ধ হন। সম্যক সম্বুদ্ধের বৈশিষ্ট্য হলো— সবার মুক্তির মাধ্যমেই নিজের মুক্তির সাধনায় রত থেকে পারমী পূর্ণ করেন। সাধনার উৎস বিবেচনায় বোধিসত্ত্বকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

ক) প্রজ্ঞাধিক বোধিসত্ত্ব

খ) শ্রদ্ধাধিক বোধিসত্ত্ব

গ) বীর্যাধিক বোধিসত্ত্ব

ক) প্রজ্ঞাধিক বোধিসত্ত্ব: প্রজ্ঞা সাধনার মাধ্যমে যে বোধিসত্ত্ব পারমী পূরণের লক্ষ্য অর্জন করেন, তাঁকেই প্রজ্ঞাধিক বোধিসত্ত্ব বলে। প্রজ্ঞা পারমী অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের চিত্তকে পূর্ণতা সাধন করাই এ বোধিসত্ত্বের মূল লক্ষ্য। এই বোধিসত্ত্বগণ সব দিক থেকে প্রজ্ঞা সাধনায় নিজের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করে অভীষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হন। তাই এরূপ বোধিসত্ত্বকে প্রজ্ঞা পারমী বোধিসত্ত্ব নামে আখ্যায়িত করা হয়।

খ) শ্রদ্ধাধিক বোধিসত্ত্ব: যে বোধিসত্ত্ব পারমী পূরণে শ্রদ্ধাকে প্রধানভাবে অবলম্বন করেন তাঁকেই শ্রদ্ধাধিক বোধিসত্ত্ব বলে। শ্রদ্ধাধিক বোধিসত্ত্বগণ সবসময় নিজের ব্রত সাধনায় নিবেদিত থাকেন। তাঁরা একবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে সে আদর্শ থেকে সহজে লক্ষ্যচ্যুত হন না। সকল পারমী পূরণে শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজেকে অটল রাখেন।

গ) বীর্যাধিক বোধিসত্ত্ব: বীর্যাধিক বোধিসত্ত্ব পারমী একটি কঠিন ব্রত সাধনা। বীর্যাধিক বোধিসত্ত্ব পারমী পূরণে কর্মপ্রচেষ্টাকে প্রথমেই স্থান দেন বলে তাঁকেই বীর্যাধিক বোধিসত্ত্ব বলে। এ সাধনায় রত বোধিসত্ত্বগণকে সব সময় সাধনায় অটল থাকতে হয়। তাঁরা বীর্য পারমী অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের চিত্তকে অভীষ্ট লক্ষ্যে চালিত করেন।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩

বোধিসত্ত্ব কত প্রকার ও কী কী? এর মূল বিষয় নিজ ভাষায় লিখে ফেলি।

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

বোধিসত্ত্বের গুণাবলি: বোধিসত্ত্বের প্রথম গুণ দশ পারমীর পূর্ণতাসাধনে প্রতজ্ঞাবদ্ধ থাকা। এটিকে প্রকারান্তরে বোধিসত্ত্বগুণও বলা হয়। বোধিসত্ত্বগুণ হঠাৎ সৃষ্টি হয় না, দশ পারমী পূরণের ক্রমধারায় বোধিসত্ত্বের জীবনাচরণে অনেক ইতবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়, যার ফলে তিনি হয়ে ওঠেন অনন্য ও অসাধারণ গুণের অধিকারী। এই অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হলো বোধিসত্ত্বের গুণ। এ গুণের প্রভাবে বোধিসত্ত্ব জন্মজন্মান্তরের সাধনায় নির্দিষ্ট পারমীসমূহ অর্জন করেন।

সাধারণভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বোধিসত্ত্বের চেতনা থাকলেও সকলেই বোধিসত্ত্বগুণ অর্জন করতে পারেন না। যিনি বুদ্ধত্বলাভের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে পারমী পূরণ করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেন তিনিই প্রকৃত বোধিসত্ত্ব।

নিচে বোধিসত্ত্বের উল্লেখযোগ্য গুণসমূহ দেওয়া হলো:

১. সর্ব বিষয়ের অনিত্যতার বোধ বোধিসত্ত্বের প্রধান গুণ।

২. সর্ব সত্তা বা সকল প্রাণীর কল্যাণ কামনা।

৩. নিজের কর্মকেই জন্ম-জন্মান্তরের সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ।

৪. বুদ্ধত্ব লাভই বোধিসত্ত্বের একমাত্র লক্ষ্য। নাম, যশ ও খ্যাতিতে তাঁদের উৎসাহ থাকে না।

৫. বোধিসত্ত্বগণ কিছুতেই সত্যসাধনা থেকে বিচ্যুত হন না।

৬. বোধিসত্ত্বগণ সর্বদা সত্য ন্যায় ও ত্যাগের মহিমায় শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলন করেন।

৭. বোধিসত্ত্বগণ যে কোনো অবস্থায় মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার সর্বোত্তম অনুশীলন চালিয়ে যান।

বুদ্ধ কর্তৃক নালগিরি হস্তীকে দমন

বোধিসত্ত্বের গুরুত্ব: বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধের পরপরই বোধিসত্ত্বের গুরুত্ব। বুদ্ধত্ব অর্জনের আগের স্তর হলো বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দশ পারমী পূর্ণ করলে বুদ্ধত্ব লাভ সম্ভব। এ পারমীসমূহ পূরণ করার জন্য বহু জীব বা সত্ত্ব হিসেবে বহুবার জন্মগ্রহণ করে কুশল কর্ম সম্পাদন করতে হয় । তাই বোধিসত্ত্বের গুরুত্ব অনেক। বৌদ্ধধর্মের অপর ধারা মহাযানী মতে, বুদ্ধত্ব লাভ করে কেবল নিজে নির্বাণ সাক্ষাতের পরিবর্তে জগতের সকল সত্তার মুক্তি তাঁদের পরম ব্রত। এ লক্ষ্যে তাঁরা বোধিসত্ত্বকে কয়েকটি গুণের অধিকারী কল্পনা করে কয়েক প্রকার বোধিসত্ত্বের সাধনা করেন। তাঁরা প্রত্যেকে দান, ধ্যান, শীল, বীর্য, ক্ষান্তি, প্রজ্ঞা প্রভৃতি সদ্গুণের চর্চা বা পারমিতা অনুশীলন করে বোধিসত্ত্ব হবেন এবং জরা মৃত্যু ও দুঃখ থেকে সমস্ত জীবকে মুক্ত করবেন। এসব কারণে বৌদ্ধধর্মে বোধিসত্ত্বের গুরুত্ব বুদ্ধের চেয়ে কম নয়।

শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে ধর্মীয় সংগীত করছে

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৪

বোধিসত্ত্বের কোন কোন তুমি চর্চা করো/করতে চাও এবং কীভাবে চর্চা করো/করতে চাও সে বিষয়ে একটি অভিজ্ঞতা ও পরিকল্পনা উপস্থাপনা করো এবং তোমার সহপাঠীর সঙ্গে বিনিময় করো। (এক্ষেত্রে পাওয়ার পয়েন্ট/পোস্টার/চিত্র উপস্থাপন করতে পারো)

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৫

উপস্থাপনার অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে তোমার লিখিত মতামত দাও
কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)?
কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)?
সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?
ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)?

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

ফিরে দেখা: নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে এবং না হলে না এর ঘরে (✓) চিহ্ন দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না

বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের আচরণবিধি

এ অধ্যায় থেকে আমরা ধারণা নিতে পারব—

- বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের পরিচয়;
- বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের শীল অনুশীলন;
- বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পাতিমোক্ষ শীল;
- বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের পালণীয় কর্তব্যসমূহ।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৬

আজ আমাদের মাঝে একজন অতিথি বক্তা (বৌদ্ধ ভিক্ষু বা অভিজ্ঞ অনুশীলনকারী) রয়েছেন। আমরা তাঁর বাস্তব জীবনের গল্প শুনব।

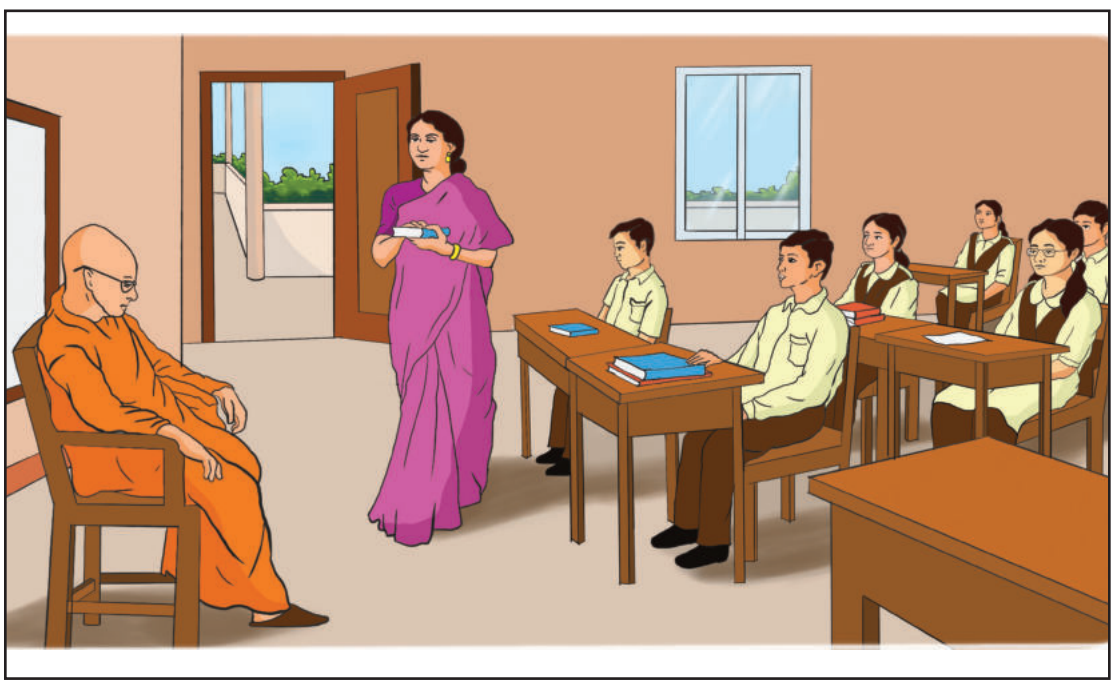

একজন পূজনীয় ভিক্ষু শ্রেণিকক্ষে বক্তব্য দিচ্ছেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৭

আমরা যে অতিথি বক্তার বক্তব্য শুনলাম, সেই অভিজ্ঞতাটি নিজের ভাষায় নিচে লিখে ফেলি।

অভিজ্ঞতা

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

মানুষ সুষ্ঠু জীবনযাপন করার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে কতগুলো কাজ নিয়মিত করে। এর মধ্যে কিছু কাজ শরীর, মন সুস্থ রাখার জন্য, কিছু কাজ জীবিকা উপার্জনের জন্য এবং কিছু ধর্মীয় রীতিনীতির অনুসরণ। এভাবে বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং গৃহীদের কিছু নির্দিষ্ট ধর্মীয় আচরণ রয়েছে। ভিক্ষু শ্রমণ এবং গৃহীরা এসব আচরণ মেনে চললে ধর্মীয় বিধান রক্ষার পাশাপাশি সংঘ এবং সমাজের শৃঙ্খলা পরিপূর্ণভাবে বজায় থাকে।

বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের পরিচয়

সংসার জীবন ত্যাগ করে যাঁরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন তাঁরা শ্রমণ এবং শ্রমণেরা নির্দিষ্ট সময়ে উপসম্পদা গ্রহণ করলে তাঁরা ভিক্ষু হিসেবে অভিহিত হন। সাধারণভাবে সাত বছর হলে শ্রমণ এবং শ্রমণ হিসেবে বিশ বছর অতিবাহিত করে ভিক্ষু হওয়া যায়। ভিক্ষুদের পরম লক্ষ্য নির্বাণ সাধনা হলেও ভিক্ষুসংঘ এবং গৃহীদের মধ্যে বুদ্ধ নির্দেশিত শিক্ষার প্রচার ও অনুসরণ করাও তাঁদের কর্তব্য। তথাগত বুদ্ধ তাঁর ধর্ম প্রচার, সংরক্ষণ এবং সুষ্ঠুভাবে নির্বাণসাধনার লক্ষ্যে ভিক্ষুদের জন্য কিছু বিধিবিধান নির্দেশ করেছেন। বিনয়পিটকে বর্ণিত এসব বিধিবিধানই ভিক্ষুদের আচরণবিধি হিসেবে সেই সময় থেকে অনুসৃত হচ্ছে।

বৌদ্ধ গৃহী বলতে সাধারণত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সংসারধর্ম পালনকারীকে বোঝায়। সংসারধর্ম পালন করতে গিয়ে মানুষ বিভিন্ন কারণে সমাজবদ্ধ হয়। সমাজে বসবাস করতে হলে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। সে অবস্থায় গৃহীরা যাতে ধর্মের পথে শান্তি ও কল্যাণময় জীবনযাপন করতে পারে, তথাগত বুদ্ধ সে সম্পর্কেও কিছু উপদেশ দিয়েছেন। এসবই গৃহীদের আচরণবিধি হিসেবে পরিগণিত হয়। বুদ্ধের এই অনুশাসন বা বিধিগুলো গৃহীদের জন্য অবশ্যপালনীয়।

বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের পালনীয় শীল

শ্রমণ ও ভিক্ষুরা গৃহ ও সংসার ত্যাগ করে নির্বাণ সাধনায় নিমগ্ন থাকেন। তাঁদের নির্বাণ সাধনার স্থান হলো বিহার, যা তাঁদের আবাসস্থানও বটে। বিহারে অবস্থানকারী ভিক্ষু-শ্রমণদের ব্রহ্মচর্যা পালনে বিঘ্ন না ঘটার জন্য তাঁদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে সংযমী হতে হয়। যেমন–

ভিক্ষুদের জন্য পাতিমোক্‌খ শীল:

'পাতিমোক্‌খ' গ্রন্থে ভিক্ষুদের পালনীয় ২২৭টি শীলের কথা আছে। ভিক্ষুদের এসব শীল আবশ্যিকভাবে পালন করতে হয়। 'পাতিমোক্‌খ' গ্রন্থে ভিক্ষুদের অবশ্য পালনীয় এসব বিধি-বিধানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ভিক্ষুদের প্রতিমাসে অন্তত দুবার, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার চতুর্দশীতে পাতিমোক্‌খ আবৃত্তি করতে হয়। পাতিমোক্‌খ বর্ণিত অধিকাংশ শীল রাজগৃহে বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত হয়েছিল। ভিক্ষুদের জন্য বিধিবদ্ধ হয়েছে বলে এই শীলসমূহ ভিক্ষুশীল নামে অভিহিত। গুরুত্ব অনুসারে ভিক্ষুশীলসমূহকে আট ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা: পারাজিকা, সংঘাদিসেস, অনিয়ত, নিসগ্‌গিয়া, পাচিত্তিয়া, পাটিদেসনিয়া, সেখিয়া এবং অধিকরণ সমথ।

ভিক্ষুদের পাতিমোক্‌খে বর্ণিত বিধিবিধানসমূহ অবশ্যই পালন করতে হয়। তথাগত বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণের পূর্বে তাঁর অন্তিম দেশনায় অপ্রমত্ত হয়ে কর্তব্য সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন-যতদিন ভিক্ষুসঙ্ঘ শুদ্ধাচারী হয়ে সত্যপথে চলবে ততদিন সদ্ধর্ম পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

ভিক্ষু শ্রমণদের প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা:

ভিক্ষু-শ্রমণেরা গৃহীদের কাছ থেকে চারটি মৌলিক উপাদান দান হিসেবে গ্রহণ করেন। সেগুলো হলো– আহার, বাসস্থান, পরিধেয় বা চীবর এবং ওষুধ-পথ্য। এ চারটি বস্তুকে এককথায় বলা হয় চতুর্প্রত্যয় গৃহীরা ভিক্ষুক চতুর্প্রত্যয় দান করেন বলে তাঁরা দায়ক দায়িকা হিসেবে অভিহিত। ভিক্ষু-শ্রমণেরা চতুর্প্রত্যয় গ্রহণ বা ব্যবহার করার সময় সে বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভের জন্য প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা করেন। প্রত্যবেক্ষণ শব্দের অর্থ সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ। এ ভাবনা চার প্রকার; যেমন–

ক) আহার গ্রহণ করার সময়, "আমি কেবল জীবন-ধারণের জন্য এ আহার গ্রহণ করছি। শারীরিক সৌন্দর্য কিংবা শক্তি বৃদ্ধির জন্য নয়।"

খ) চীবর পরিধানের সময়, "পোকা-মাকড়, সরীসৃপ-জাতীয় প্রাণীর কাপড়, শীত ও উষ্ণতা নিবারণ, ধুলা-বালি, লজ্জা নিবারণ প্রভৃতি থেকে সুরক্ষার জন্য এ চীবর পরিধান করছি। আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য নয়।"

গ) শয্যা গ্রহণের সময়, "এ শয্যা কেবল শীত ও উষ্ণতা নিবারণের জন্য, দংশক-ধুলাবালি-রৌদ্র-পোকামাকড়, সরীসৃপ প্রভৃতির আক্রমণ নিবারণ এবং চিত্তের একাগ্রতা সাধনের জন্য। আলস্য বা নিদ্রায় অনর্থক কালক্ষেপণের জন্য নয়।"

ঘ) ওষুধ গ্রহণের সময়, "কেবল রোগ উপশমের জন্য প্রয়োজনমতো এ ওষুধ সেবন করছি। অন্য কোনো অকুশল উদ্দেশ্যে নয়।"

উল্লিখিত প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা ভিক্ষু-শ্রমণদের মনে লোভ-দ্বেষ-মোহ বিনাশের হেতু হয়।

চার অকরণীয়:

ভিক্ষু-শ্রমণদের চারটি কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়, যাকে চার অকরণীয় বলে। যথা- ১. ব্যভিচার না করা ২. চুরি না করা ৩. জীবহত্যা না করা এবং ৪. দৈবশক্তিসম্পন্ন বলে দাবি না করা এবং দৈবশক্তি প্রদর্শন না করা। চতুর্থ অনুশাসনটি প্রবর্তিত হয়েছিল বৈশালীতে দুর্ভিক্ষ শুরু হওয়ার পর। সে সময় কিছু কিছু ভিক্ষু নিজেদের দৈবশক্তির অধিকারী বলে প্রচার করে গৃহীদের মনোযোগ আকর্ষণপূর্বক খাদ্য সংগ্রহ করত। বুদ্ধ সেজন্য দৈবশক্তিসম্পন্ন বলে প্রচার ও তা প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকার জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করেন।

সংযম ব্রত:

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সোনা রুপা গ্রহণ করা একবারেই বারণ। যদি কোনো গৃহস্থ তা দান করেন তাহলেও ভিক্ষু তা নিজের জন্য রাখতে পারবেন না। হয় তা দাতাকে ফেরত দেবেন অথবা অন্য কোনো গৃহস্থকে দান করবেন। অন্য কোনো গৃহস্থকে দান করার ফলে তিনি তার বিনিময়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিতে পারবেন। তবে সেগুলো ভিক্ষু নিজের জন্য নিতে পারবেন না। অন্য ভিক্ষু বা ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য নিতে পারবেন। বুদ্ধ শাসনের উন্নতির জন্য ভিক্ষুসঙ্ঘ ভূমি, বিহার প্রভৃতি স্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ করতে পারবেন। বুদ্ধের সময় রাজা, মহারাজা ও গৃহীরা এরকম দান করতেন। তবে এগুলো সঙ্ঘসম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হবে।

আহার: ব্রহ্মচর্য প্রতিপালনকারীরা একাহারী। সাধারণত মধ্যাহ্নের আগে দুপুর বারোটার আগে অর্থাৎ আহার গ্রহণ করতে হয়। বুদ্ধের সময়ে পিণ্ডচারণের মাধ্যমে ভিক্ষু-শ্রমণেরা গৃহীদের বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতেন। এখনো বাংলাদেশে কিছু কিছু জায়গায় এ প্রথা চলমান আছে। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভিক্ষু-শ্রামণদের গৃহীদের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করলে সেখানে আহার গ্রহণ করা যায়।

নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য: ভিক্ষুদের নিজস্ব কোনো সম্পদ নেই। তাঁদের সম্পদ বলতে বোঝায় তিনটি চীবর, যথা: সংঘাটি, উত্তরাসঙ্গ, অন্তর্বাস, ভিক্ষাপাত্র, ক্ষুর, সুঁচ-সুতা, কটিবন্ধনী এবং জল ছাঁকুনি। এগুলোই ভিক্ষু-শ্রমণদের জীবনধারনের জন্য যথেষ্ট বলে বুদ্ধের নির্দেশনা রয়েছে। এগুলো সংক্ষেপে অষ্টপরিষ্কার হিসেবে অভিহিত, যা প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণের সময় দান করা হয়।

সমবেত প্রার্থনা

দশশীল: ত্রিশরণসহ দশশীল শ্রমণদের জন্য দৈনন্দিন জীবনে প্রতিপালন করা অত্যাবশ্যকীয়। দশশীল সমূহ হলো: ১. জীবহত্যা ২. চুরি ৩. ব্যভিচার ৪. সুরা পান ৬. বিকালভোজন ৭. নৃত্যগীতে অনুরক্তি ৮. গন্ধমাল্য প্রভৃতি ধারণ ৯. আরামদায়ক শয্যায় শয়ন এবং ১০ সোনা-রুপা গ্রহণ ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা।

পঞ্চভাবনা: ভিক্ষু-শ্রমণদের জন্য ভাবনা একটি নিত্যকর্ম। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, অশুভ ও উপেক্ষা এই ভাবনাগুলো অবলম্বন করে গৈরিক জীবনের লোভ, দ্বেষ, মোহ দূরীভূত হয়, যা বৌদ্ধধর্মে পঞ্চভাবনা নামে অভিহিত। ভিক্ষু-শ্রমণদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা পঞ্চভাবনা চর্চা করা দরকার, যা পালন করলে মন শান্ত থাকে এবং নৈতিক জীবন সুন্দর হয়।পঞ্চভাবনা নিম্নরূপ-

মৈত্রী ভাবনা: সকল প্রাণী শত্রুহীন হোক, বিপদহীন হোক, ভয়হীন হোক, সুখে বাস করুক–এরুপ কল্যাণকামনাই মৈত্রী ভাবনা।

করুণা ভাবনা: দুঃখীর দুঃখে ব্যথিত হয়ে 'দুঃখমুক্তি' কামনা করাকে করুণা ভাবনা বলে।

মুদিতা ভাবনা: অপরের সৌন্দর্য, যশ, লাভ, ঐশ্বর্য, অথবা সৌভাগ্য দেখে নিজচিত্তে আনন্দ অনুভব করাই মুদিতা। 'সকল প্রাণী যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক'- এটি হলো মুদিতা ভাবনার মূলমন্ত্র।

অশুভ ভাবনা: শরীর ব্যাধি ও অশুচির আধার, অনিত্য এবং মৃত্যুর অধীন। এ বিষয়গুলো অবলম্বন করে ভাবনা করাই হচ্ছে অশুভ ভাবনা।

উপেক্ষা ভাবনা: লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি অষ্টপ্রকার লোকধর্মে চিত্তকে অবিচলিত রেখে ভাবনা করাই হচ্ছে উপেক্ষা ভাবনা।

ধ্যান ও সমাধি: ব্রহ্মচর্য জীবন পালনে ধ্যান ও সমাধি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিত্যকর্ম, যা ভিক্ষু-শ্রমণের পালন করেন। চিত্তের একাগ্রতা সাধন করার মূলে ধ্যান সমাধি প্রধান অঙ্গ। তৃষ্ণার বশীভূত হয়ে মানুষ লোভ, দ্বেষ ও মোহে জর্জরিত হয়ে দুঃখে পতিত হয়। এসব স্বভাবের কারণে মানুষ চঞ্চল, অসংযত ও মানসিক অশান্তি ভোগ করে। নিয়মিত ধ্যান ও সমাধির মাধ্যমে চিত্তে একাগ্রতা সাধন সম্ভব, যা আসক্তি দূরীভূত হয়। বুদ্ধের নির্দেশিত ধ্যানানুশীলনকে বিদর্শন ভাবনা বলা হয়। এই বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনে নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। শীল ব্যতীত সমাধি হয় না, সমাধি ব্যতীত প্রজ্ঞা হয় না। প্রজ্ঞাই হচ্ছে নির্বাণের শেষ স্তর।

ভিক্ষুদের সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম: মহাপরিনির্বাণ সূত্রে বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে সাতটি বিধানের দেশনা করেছিলেন, যা ভিক্ষুদের সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম নামে আখ্যায়িত। এগুলো যথাযথভাবে অনুশীলন করলে ভিক্ষুদের পরাজয় ঘটবে না। নিচে তা দেওয়া হলো:

১. ভিক্ষুগণ একত্রে সম্মিলিত হয়ে কাজ করবেন।

২. ভিক্ষুগণ একতার মাধ্যমে সঙ্ঘ-কর্তব্য সম্পাদন করবেন।

৩. ভিক্ষুগণ বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের সম্মান,পূজা ও সেবা করবেন।

৪. ভিক্ষুগণ প্রয়োজনীয় নির্দেশিত শিক্ষাপদসমূহ প্রতিপালন করবেন।

৫. ভিক্ষুগণ পুনর্জন্মের কারণ তৃষ্ণার বশবর্তী হবেন না।

৬. ভিক্ষুগণ অরণ্যে বা একান্তে নির্বাণ সাধনায় মনোনিবেশ করবেন।

৭. ভিক্ষুগণ আগত ও অনাগত ভিক্ষু-শ্রমণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করবেন।

গৃহীদের আচরণবিধি

বৌদ্ধভিক্ষু ও গৃহীদের সমন্বিত প্রয়াসেই বৌদ্ধসমাজ প্রবহমান। আমরা জানি যে, যে কোনো সমাজের প্রগতি ও উন্নয়ন নির্ভর করে সে সমাজের ঐক্য ও সংহতির ওপর। পারস্পরিক দায়িত্ব কর্তব্য যথাযথ পালনের মাধ্যমেই সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। তাই.সামাজিক একতার জন্য প্রয়োজন শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন ও সচেতন কর্তব্যবোধ। এরূপ জীবন একদিনে গড়ে ওঠেনা। এর জন্য দৈনন্দিন জীবনে কিছু করণীয় রয়েছে। যা অনুসরণ ও অনুশীলন করলে গৃহীদের জীবন মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। পবিত্র ত্রিপিটকে এ বিষয়ে তথাগত বুদ্ধ গৃহীদের জন্য কিছু বিধি-বিধান প্রদান করেছেন। এগুলোকে গৃহী বিনয়ও বলে। গৃহী বিনয়ের এ বিধানগুলো ত্রিপিটকে বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে বিন্যস্ত। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সূত্র হলো সিগালোবাদ সূত্র, কলহবিবাদ সূত্র, পরাভব সূত্র, মঙ্গালসূত্র, ব্যাগ্গপজ্জ সূত্র, খগ্গবিসান সূত্র, লক্খণ সূত্র, গৃহীপতিপদা সূত্র, ধম্মিক সূত্র প্রভৃতি।

তথাহত বুদ্ধ ধর্মোপদেশের মাধ্যমে প্রদত্ত এই জীবন বিধান বা অনুশাসন গৃহী বৌদ্ধদের জন্য অবশ্যপালনীয়। এখানে কয়েকটি সূত্র হতে গৃহীদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

ভিক্ষুর তত্ত্বাবধানে গৃহিদের সমাধি চর্চা

১। সিগালোবাদ সূত্র:

একদিন রাজগৃহে বেণুবন বিহারে অবস্থানকালে বুদ্ধের সাথে সিগালক নামে এক ব্রাহ্মণ পুত্রের দেখা হয়। সে সময় সিগালক ¯স্নানশেষে সিক্ত বস্ত্রে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ উর্ধ্ব অধঃ- ষড়দিকে নমস্কার করছিলেন। বুদ্ধ তাকে এর

কারণ জিজ্ঞাসা করলে সিগালক বলে, পৈতৃক প্রথা ও পিতার নির্দেশে তিনি ষড়দিকে নমস্কার করছেন। বুদ্ধ বুঝতে পারলেন সিগালক ষড়দিক বন্দনার মর্মাথ তিনি নিজে জানেন না। অতঃপর, বুদ্ধ তাকে ষড়দিক বন্দনায় মর্মাথ ব্যাখ্যা করে গৃহীদের করণীয় সম্পর্কে যে অনুশাসন প্রদান করেন, তা সর্বজনীন নিত্য পালনীয় কর্ম হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্ববহ। নিচে এ বিষয়ে কিছু তুলে ধরা হলো:

চার প্রকার ক্লিষ্টকর্ম বর্জন: এ বিষয়ে তথাগত বুদ্ধ বলেন, চারদিক বন্দনা মানে, ধার্মিক উপাসকদের চারটি ক্লিষ্ট কর্ম পরিত্যাগ করা। ক্লিষ্ট কর্ম হলো যে কর্ম পরবর্তীতে দুঃখ, কষ্ট আনয়ন করে। সেগুলো হলো প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, ব্যভিচার ও মিথ্যা ভাষণ-ধার্মিক গৃহীর এই চার প্রকার ক্লিষ্টকর্ম বর্জন করা উচিত। এছাড়া তথাগত বুদ্ধ আরো বলেন-

চার প্রকার পাপকর্ম বর্জন: স্বেচ্ছাচারিতা, হিংসা, ভয় ও অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে পাপানুষ্ঠান করা- এ চার প্রকার পাপকর্ম ধার্মিক গৃহীর পরিত্যাগ করা উচিত। এসব পাপকর্ম যশ-খ্যাতি ক্ষয় করে।

ষড়দোষ বর্জন: ষড়দিক প্রার্থনা সম্পর্কে বুদ্ধ বলেন, ছয়টি অকরণীয় বিষয়ে সচেতন হওয়া। নেশাদ্রব্য গ্রহণ, অসময়ে ভ্রমণ, আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত, দ্যুত ক্রীড়া, কুসংসর্গ, আলস্যপরায়ণতা- এই ষড়দোষ ধার্মিক গৃহীর পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ:

ক) নেশা গ্রহণের ফলে ছয়টি বিষময় ফল ভোগ করতে হয়। যথা- ১. অকারণে ধনহানি ঘটে, ২. কলহ বৃদ্ধি পায়, ৩. বিবিধ রোগের উৎপত্তি ঘটে, ৪. দুর্নাম রটে, ৫, নির্লজ্জ হয় এবং ৬. হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়। এসব কারণে জীবনহানিও ঘটতে পারে।

খ) অসময়ে ভ্রমণের ফলে ১. নিজে অরক্ষিত থাকে, ২. স্ত্রী-পুত্র অরক্ষিত থাকে, ৩. বিষয়সম্পত্তি অরক্ষিত থাকে ৪. সর্বদা আশঙ্কাযুক্ত হয়ে চলতে হয়, ৫. পাপকর্মে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপিত হয় এবং ৬. বিভিন্ন রকমের দুঃখজনক বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়।

গ) আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকলে সর্বদা উৎকণ্ঠিত চিত্তে কালযাপন করতে হয়।

ঘ) দ্যুত ক্রীড়া অর্থাৎ তাস, পাশ, জুয়া জাতীয় খেলায় ১. জয়ী ব্যক্তির শত্রু বৃদ্ধি পায় ২. পরাজিতের অনুশোচনা হয়, ৩. সম্মানহানি ঘটে ৪. সভা-সমিতিতে কথার মূল্য থাকে না, ৫. মিত্র-পরিজনদের নিকট লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় এবং ৬. স্ত্রী-সন্তানের ভরণপোষণে অসমর্থ হয়।

ঙ) কুসংসর্গের ফলে ১ ধূর্ত ২. দুশ্চরিত্র ৩. নেশাগ্রস্থ, ৪. জুয়াড়ি, ৫ প্রবঞ্চক এবং ৬. ডাকাত জাতীয় ব্যক্তি বন্ধু হয়। ফলে চরিত্র কলুষিত ও জীবনহানি হয়।

চ) আলস্যপরায়নতার ফলে অনুৎপন্ন ধন উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন ধন ধ্বংস হয়। এছাড়া তথাগত বুদ্ধ এ বিষয়ে আরো কিছু পরামর্শ প্রদান করেন। যেমন-

মিত্রের লক্ষণ: যে ব্যক্তি বন্ধুকে পাপকার্য হতে নিবৃত্ত করেন, মঙ্গালকার্যে প্রবৃত্ত করেন অশ্রুত বিষয় শ্রবণ করায়, স্বর্গে যাওয়ার পথ নির্দেশ করে এরূপ ব্যক্তিকে প্রকৃত বন্ধু বা মিত্র বলে জানবে। এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত।

অমিত্রের লক্ষণ: যে সর্বদা অপরের ধন হরণ করে, বাক সর্বস্ব, চাটুকার ও প্ররোচক- এরূপ ব্যক্তি মিত্ররূপী অমিত্র। তাকে বর্জনীয়।

গৃহীর ষড়দিক: ধার্মিক গৃহীর ছয় প্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা উচিত। একে গৃহীর ষড়দিক রক্ষা করা বলে।

ক) পূর্ব দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে মাতাপিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা। পাঁচভাবে মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হয়। যথা- ১. বৃদ্ধকালে মাতা-পিতার ভরণ পোষণ করা, ২. নিজের কাজের আগে তাঁদের কাজ সম্পাদন করা, ৩. বংশ মর্যাদা রক্ষা করা, ৪. মাতা-পিতার বাধ্যগত থেকে তাঁদের বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ এবং ৫. মৃত জ্ঞাতিদের উদ্দেশে দান দেওয়া। মাতাপিতাও সন্তানের প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা ১. পাপ হতে নিবৃত্ত করা, ২. কল্যাণকর্মে প্রবৃত্ত করা ৩. উপযুক্ত সময়ে বিদ্যা শিক্ষা দান করা ৪. পরিণত বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা, ৫. যোগ্যতা চিন্তা করে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা।

খ) পশ্চিম দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালন করা। স্ত্রী প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা: ১. স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রর্দশন করা, ২. ভদ্র ব্যবহার করা, ৩. পরস্ত্রীতে আসক্ত না হয়ে স্বীয় স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, ৪. বৈষয়িক ব্যাপারে কর্তৃত্ব দেওয়া এবং ৫. সাধ্যমতো বস্ত্রালংকার দেওয়া। স্ত্রীকেও স্বামীর প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা: ১. সুচারুরূপে গৃহকার্য করা, ২. পরিজনবর্গ ও অতিথিদের প্রতি সাদর সম্ভাষণ করা, ৩. স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ রাখা, ৪. স্বামীর সঞ্চিত ধন অপচয় না করা এবং ৫. গৃহকর্মে নিপুণা এবং অলস না হওয়া।

গ) উত্তর দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের প্রতি কর্তব্য পালন করা। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা: দান ও সামগ্রিক অর্থ সাহায্য করা, ২. প্রিয়বাক্য বলা, ৩. হিতাচরণ করা, ৪. প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রদর্শন করা এবং ৫. সরল ব্যবহার করা। আত্মীয়স্বজন ও কুলপুত্রে প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য করতে হয়। যতা: ১। প্রমত্তকালে তাকে রক্ষা, ২. তার ধনসম্পত্তি রক্ষা করা, ৩. ভয়ে আশ্বস্ত করা, ৪. বিপদকালে তাকে ত্যাগ না করা এবং ৫. তাকে সম্মান করা।

ঘ) দক্ষিণ দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে গুরুর প্রতি কর্তব্য পালন করা। গুরুর প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা: ১. গুরুর সামনে উচ্চ আসনে না বসা, ২. সেবা করা, ৩. আদেশ পালন করা, ৪. মনোযোগ সহকারে উপদেশ শ্রবণ করা এবং ৫. বিদ্যাভ্যাস করা। গুরুকেও শিষ্যের প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা: ১. সুন্দররূপে বিনীত করা, ২. খুঁটিনাটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া, ৩. পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করে দেওয়া, ৪. বন্ধুদের নিকট ছাত্রের প্রশংসা করা এবং ৫. বিপদে রক্ষা করা।

ঙ) উর্ধ্ব দিতে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের প্রতি কর্তব্য পালন করা। শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা: ১. শ্রদ্ধাচিত্তে অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ বাসস্থান প্রভৃতি দিয়ে সেবা করা, ২. জনসাধারণকে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করে তোলা, ৩. তাঁদের হিত কামনা করা, ৪. শ্রদ্ধাচিত্তে তাঁদের অভ্যর্থনা জানানো এবং ৫. উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য দিয়ে অ্যাপ্যায়ন করা। শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণও ও গৃহীর প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা: ১. তাকে পাপকর্ম হতে নিবৃত্ত রাখা, ২. কল্যাণকর্মে প্রবৃত্ত করা, ৩. তাদের হিত কামনা করা, ৪. অশ্রুত বিষয় ব্যক্ত করা এবং ৫. জ্ঞাত বিষয় সংশোধন করে দেওয়া ও সুমার্গ প্রদর্শন করা।

চ) অধঃ দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে কর্মচারীদের প্রতি কর্তব্য পালন করা। কর্মচারীদের প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা: ১. সামর্থ অনুযায়ী কার্যভাব অর্পণ করা, ২. উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া, ৩. রোগের সময় সেবা করা, ৪. উৎকৃষ্ট খাদ্য ভাগ করে দেওয়া এবং ৫. মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম দেওয়া। কর্মচারীদেরও

গৃহস্বামীর প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা: ১. গৃহস্বামীর পূর্বে শয্যা ত্যাগ করা, ২. পরে শয়ন করা, ৩. কেবল প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করা, ৪. যথাযথভাবে কর্ম সম্পাদনা করা এবং ৫. গৃহস্বামীর সুখ্যাতি ও প্রশংসা করা।

২) ব্যগ্ঘপজ্জ সূত্র:

এ সূত্রেও তথাগত বুদ্ধ গৃহীবিধান বিষয়ে কোলীয় বংশের ব্যগ্ঘপজ্জ নামক এক ব্রাহ্মণকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। এক সময় বুদ্ধ কোলীয় গ্রামে অবস্থান করছিলেন। ব্যগ্ঘপজ্জ নামক একজন কোলীয় বুদ্ধের নিকট সংসারে আবদ্ধ গৃহীদের ইহকাল ও পরকালে হিতের জন্য কিছু নির্দেশনা দেয়ার অনুরোধ করেন। বুদ্ধ গৃহীজীবনে মঙ্গলজনক চারটি বিষয় মেনে চলার নির্দেশ দেন। নিদের্শনাসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো:

উৎসাহ: পরিশ্রম ও সৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্বাহে উৎসাহী হতে হবে। যেকোনো কাজ সুসম্পন্ন করার প্রতি উৎসাহী হতে হবে।

সংরক্ষণ: সদুপায়ে কষ্টে অর্জিত অর্থসম্পদ সর্তকতার সাথে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে চোর, অপহরণকারী, ঈর্ষাপরায়ণ জ্ঞাতি বা আগুন দ্বারা নষ্ট না হয়।

সৎলোকের সংশ্রব: ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাশীল, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, শীলবান, অপরের মঙ্গলকামী ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত। এঁদের সৎ গুণাবলি অনুসরণ করা উচিত। এঁরাই কল্যাণমিত্র। সৎ জীবন গঠনে এঁদের সংশ্রব অপরিহার্য।

শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবযাপন: আয় বুঝে ব্যয় করা গৃহীর একান্ত কর্তব্য। মিতব্যয়ী হতে হবে। আবার কৃপণতাও পরিহার করতে হবে। আয়-ব্যয় সমন্বয় করে যথারীতি জীবিকা নির্বাহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন বলে।

বুদ্ধ এ-প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, চারটি গুণে গুনান্বিত হলে ইহ ও পরকালে মহা উপকার সাধিত হয়।

সে চার গুণ হলো –শ্রদ্ধাগুণ, শীলগুণ, দানগুণ ও প্রজ্ঞাগুণ।

৩. আয়-ব্যয় বিষয়ে বুদ্ধের উপদেশ:

বুদ্ধ আয় বা লাভের অংশকে চার ভাগ করে ব্যবহার করতে উপদেশ দিয়েছেন যথা:

১. একভাগ নিজে পরিভোগ করবে । এ অংশ থেকে এক ভাগ দান করবে।

২. দুই ভাগ কৃষি বা বাণিজ্যে নিযুক্ত করবে ।

৩. চতুর্থ ভাগ সঞ্চয় করে রাখবে, যাতে বিপদের দিনে ব্যবহার করা যায়।

এগুলো ছাড়াও গৃহীদের উদ্দেশ্য করে বুদ্ধ আরও অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছেন। এসব উপদেশ পালনে গৃহী-জীবন যেমন সুখের হয়, তেমন নির্বাণের পথেও অগ্রসর হওয়ার যায়। তাই এসব উপদেশ সকল গৃহীর মেনে চলা উচিত।

গৃহী নীতিমালা

মানবজীবন গঠন করার জন্য প্রত্যেক মানুষকে পরিপূর্ণ নিয়ম-নীতি অনুশীলন করা খুবই প্রয়োজন। নিয়ম-নীতি ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে সুন্দর ও আদর্শ জীবন গঠন করা সম্ভব নয়। সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধ জীবন লাভ করার জন্য বুদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। ত্রিপিটক গ্রন্থে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। দীর্ঘনিকায়ের অষ্ঠকথায় গৃহীদের বিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে ''ইমস্মিঙ পন সুত্তে যং কিঞ্চি গিহিনা কত্তব্বং অকথিতং নত্থি, তস্মা অত্থং সুত্তন্তো গিহিবিনযো নাম", অর্থাৎ গৃহীদের যা কিছু বিধিবিধান করণীয়, তা এই সূত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে। গৃহী জীবনে বুদ্ধ বিভিন্ন সূত্রে আদর্শ জীবন গঠনে করণীয় নিয়ম-নীতিগুলো প্রতিপালন করলে প্রত্যেকের জীবনে কল্যাণ সাধিত হবে। দৈনন্দিন জীবনে আদর্শ জীবন গঠনে করণীয় চারটি নিত্যকর্ম সম্পাদন করা আবশ্যক। নিচে তা তুলে ধরা হলো:

১.প্রাতঃকৃত্য: মানবজীবনে সুন্দর ও আদর্শ জীবন গঠনের জন্য সূর্যোদয়ের আগে শয্যা ত্যাগ করা উচিত। যারা ভোরভেলা শয্যা ত্যাগ করে, তাদের মানসিক প্রশান্তি বাড়ে। প্রথমে ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে প্রয়োজনে স্নান করে সকল প্রাণীর সুখও মঙ্গলের জন্য বুদ্ধের সামনে গিয়ে ত্রিরত্ন প্রার্থনা করতে হয়। সকালে বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে ফুল পূজা, ধূপবাতি পূজা, বিভিন্ন ফল ও আহার্য দ্রব্য দিয়ে বুদ্ধ পূজা করতে হয়। প্রয়োজনে বিহারে ভিক্ষুর কাছে পঞ্চশীল গ্রহণ করে সূত্র শ্রবণ করার মাধ্যমে দিনের কাজ শুরু করা উচিত।

২.সারাদিনের কর্মজীবন: মানবজীবন বড়ই দুঃখ ও কষ্টকর । সুন্দর ও আদর্শ জীবন গঠন করার জন্য সৎ উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করতে পারলে মৃত্যুর পর সুগতি প্রাপ্ত হয়। সৎ উপায়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য বুদ্ধ উল্লেখ করেছেন- অস্ত্র বাণিজ্য, প্রাণী বাণিজ্য, মাংস বাণিজ্য, বিষ বাণিজ্য, মদ বাণিজ্য এ পঞ্চ বাণিজ্য নিষিদ্ধ। সৎ উপায়ে জীবিকা অর্জনের জন্য কৃষিকাজ ও অন্যান্য বাণিজ্য করা যেতে পারে।

৩.সান্ধ্যকৃত্য: শরীর ও মন ভালো থাকার জন্য সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ ব্যায়াম করা বা পদচারণ করা উচিত। অনেকে সকালে এ ব্রত পালন করে থাকে। খোলা আকাশে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করলে শরীর রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়। অনেকে চাকরি বা ব্যবসা-বাণিজ্য শেষ করে ভালোভাবে মুখ-হাত ধৌত করে নিকটস্থ কোনো বিহার বা বাড়িতে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে এককভাবে বা সমবেতভাবে বুদ্ধ বন্দনা করে থাকে। যদি বিহাবের বৌদ্ধ ভিক্ষু থাকেন, তিনি সন্ধ্যায় একটা নির্দিষ্ট সমবেত ত্রিরত্ন বন্দনার আয়োজন করবেন, প্রয়োজনে ত্রিপিটক থেকে বিভিন্ন সূত্র পাঠ করবেন।

৪.রাতের কৃত্য: শরীর সুস্থ ও ভালো থাকার জন্য নিয়মিত আহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হলে পরিমিত আহার করা উচিত। বিশেষ করে গভীর রাতে আহার করলে স্বাস্থ্যঝুঁকি ও শরীরে খাদ্য হজম হয় না, এতে শরীরের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয়। আহার গ্রহণ করার সময় স্মৃতি সহকারে ভোজন করা ভালো। রাতে ভোজন শেষে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমানো উচিত নয়। রাতে আহার করার আগে মৈত্রীভাবনা বা মরণাস্মৃতি ভাবনা করে ঘুমালে ঘুম ভালো হয়।

সভার আচরণবিধি: যথাসময়ে অনুষ্ঠানে যাওয়া এবং সুন্দর পোশাক পরিধান করা সবার উচিত। সভায় এলে নীরবতা পালন করা একটি নৈতিক দায়িত্ব। সকলের বক্তৃতা শুনে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উত্তম।

রোগী দেখতে যাওয়া: পরিবারের কোনো আত্মীয় ও প্রতিবেশীর নিকটস্থ কেউ অসুস্থ হলে তাঁকে দেখতে যাওয়া একটি সামাজিক দায়িত্ব। যথাসময়ে তাকে ভরণপোষণ দেওয়া, সাহস দেওয়া, প্রয়োজনে ওষুধ-পথ্য দেওয়া দরকার।

ভিক্ষুসঙ্ঘের উপস্থিতিতে একটি অনিত্য সভা

মৃত দর্শন: সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অনেকসময় কোনো আত্মীয় ও পাড়াপ্রতিবেশী মৃত্যু হলে সেখানে যাওয়া নৈতিক কর্তব্য। একজন আত্মীয় হিসেবে তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানানো সামাজিক কর্তব্য। প্রয়োজনবোধে পারিবারিক কোনো অনুষ্ঠানে তাদেরকে আর্থিক,কায়িক ও বাচনিকভাবে সহযোগিতা করা উচিত।

পরিবারে ছেলেমেয়েদের কর্তব্য: পরিবারে পড়ালেখার পাশাপাশি মা-বাবাদের বিভিন্ন কাজে-কর্মে সহযোগিতা করা ছেলেমেয়েদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। এতে মা-বাবার কিছুটা কষ্ট কমে। পারিবারিক ধর্মীয় ও সামাজিক কাজে ছেলেমেয়েদের অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন।

নিত্যপালনীয় ধর্মাচার: প্রতিটি বৌদ্ধপরিবারে পূজার্চনা করার জন্য একটি করে বুদ্ধের আসন রয়েছে। প্রতিদিন বুদ্ধমূর্তিকে শ্রদ্ধা,পূজা,বন্দনা করা দরকার। দৈনিক কমপক্ষে দুবেলা বন্দনা করা সকলের উচিত।

গৃহীদের সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম: বৈশালী একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। বৈশালীবাসীদের উদ্দেশে বুদ্ধ সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম দেশনা করেন। বৈশালীতে অবস্থানকালে বজ্জীবাসীর শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকার জন্য বুদ্ধ এটি ব্যাখ্যা করেছিলেন। নিচে তা উল্লেখ করা হলো:

১. সভাসমিতিতে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে সকলে মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

২. গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্মিলিতভাবে সম্পাদন করা এবং নতুন কিছু ঘটলে তা-ও সবাই মিলিতভাবে করা।

৩. সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোনোরকম রাষ্ট্রবিরোধী কোনো নীতি চালু না করা, প্রচলিত সুনীতি উচ্ছেদ না করা এবং প্রাচীন সুনীতি ও অনুশাসন মেনে চলা।

৪. গুণী, বয়োবৃদ্ধদের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান, গৌরব ও পূজা করা এবং তাদের আদেশ পালন করা।

৫. কুলবধূ এবং কুলকুমারীদের প্রতি কোনোরকম অন্যায় আচরণ না করা অর্থাৎ স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান,মর্যাদা যথাযথভাবে রক্ষা করা।

৬. পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত বিহার, চৈত্য, এবং প্রদত্ত সম্পত্তি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা ও সদ্ধর্মে প্রতিপালনে অনুগত হওয়া।

৭. অর্হৎ ও শীলবান ভিক্ষুদের প্রয়োজনীয় দান দিয়ে সেবা করা, তাঁদের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা ও নিরাপদ অবস্থান সুনিশ্চিত করা।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৮

এসো নিজের দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদে আচরণবিধি প্রয়োগ করার চেষ্টা করি। একটি রুটিন ছকাকারে তৈরি করি এবং এক সপ্তাহের সম্পাদিত কাজের তালিকাটি শিক্ষকের নিকট জমা দিই।

সময়/বার	রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার	শনিবার
ভোরবেলা							
সকাল							
দুপুর							
বিকাল							
সন্ধ্যা							
রাত							
গভীর রাত							

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৯

দৈনিক রুটিন তৈরির অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে তোমার লিখিত মতামত দাও
কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)?
কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)?
সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?
ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)?

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

ফিরে দেখা: নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে এবং না হলে না এর ঘরে (✓) চিহ্ন দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না

প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা

এ অধ্যায় থেকে আমরা—

- প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- প্রব্রজ্যার ও সুফল সম্পর্কে জানতে পারব;
- উপসম্পদার প্রকারভেদ বিষয়ে জানতে পারব;
- প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারব।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ১০

আমরা সবাই মিলে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা উদ্‌যাপনে দর্শক হিসেবে অংশগ্রহণ করব। যা যা প্রস্তুতি নিতে হয় অথবা নির্দেশনা মেনে চলতে হবে তা শিক্ষক থেকে জেনে নিয়ে নোট করে রাখি।

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণ করা সম্ভব না হলে আমরা অন্য কোনো বিকল্প অভিজ্ঞতা অর্জন করতে করতে পারি। যেমন— ভিডিও চিত্র/স্থিরচিত্র দেখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ১১

তোমার অভিজ্ঞতাটি লেখো।

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

তিনজন ব্যক্তি ভিক্ষুসঙ্ঘের কাছে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করছেন

প্রব্রজ্যা

বুদ্ধের শাসনে শিক্ষার্থী রূপে প্রবেশের প্রথম সোপান হলো প্রব্রজ্যা। সাধারণত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে হলে পারিবারিক বা গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম বা বৈরাগ্য জীবন অবলম্বন করতে হয়। বুদ্ধের ধর্মে যাঁরা প্রথম প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে তাঁদেরকে শ্রমণ ও শ্রমণেরী বা শিক্ষামানা ও শিক্ষামানী বলা হয়। প্রব্রজিত মাত্রই গৃহত্যাগী বা সংসারত্যাগী। জাগতিক সংসার দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করে নির্বাণ লাভ করাই হলো প্রব্রজ্যা গ্রহণ করার অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় প্রব্রজ্যা প্রার্থী প্রব্রজ্যা প্রদানকারী আচার্যের নিকট প্রার্থনা করেন।

‘সংসার আর্বতের যাবতীয় দুঃখ হতে মুক্তির লক্ষ্যে নির্বাণ সাক্ষাৎকরণের জন্য আমি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহ করে আমাকে প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষিত করুন।’

প্রব্রজ্যার অর্থ হলো পাপকর্ম থেকে বিরতি বা বর্জন। পাপ বজ্জিতো বাপাপ কর্ম হতে বর্জিত। মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে বলা হয়েছে, ‘পাপকানং মলং পব্বাজেতীতি প্রর্জজ্জিত’ অর্থাৎ পাপমল বর্জনে সংকল্পবদ্ধ হন বলে তাকে প্রবজ্জিত বলা হয়। ধর্মপদ গ্রন্থে প্রব্রজ্যা শব্দের অর্থ করা হয়েছে, ‘পব্বাজযং অত্তনো মলং তস্মা পব্বজিতো’তি বুচ্চতিং’। নিজের পাপমল প্রক্ষালন বা ত্যাগ করেন বলেই প্রব্রজিত। প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠান বৌদ্ধদের অত্যন্ত ও প্রয়োজনীয় উৎসব। প্রব্রজ্যা গ্রহণের মাধ্যমে জীবনকে বৈরাগ্যময় পথে নিবিষ্ট রেখে সূচারুভাবে ধর্মময় জীবনধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। সকলের পক্ষে প্রব্রজিত জীবনে অবস্থান করা সম্ভব হয় না। কারণ প্রাণী মাত্রই ভোগ অভিলাষী, পারিবারিক বন্ধন সংসার জীবনের ভোগ-ঐশ্বর্য, লোভ-দ্বেষ-মোহে আসক্ত মানুষ সবকিছু ত্যাগ করে সংসার

বিরাগী হয়ে প্রব্রজিত জীবন যাপন করা অত্যন্ত দুরুহ। বুদ্ধ সংসারকে মরু কান্তার এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তুলনা করেছেন দুঃখের আগার ও কারাগার হিসেবে। স্ত্রী পুত্রের বন্ধনকে সবচেয়ে কঠিন বন্ধন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সুখের কামনা, ভোগের লালসায় মানুষ অবিরাম দুঃখকে বরণ করে চলেছে। এ বন্ধন হতে অল্পসংখ্যক মানুষ মাত্র প্রব্রজ্জিত হতে পারে। সুতরাং মাতা-পিতা, পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, ভোগ-ঐশ্বর্য মদিরময় রূপ যৌবনের প্রমত্ততা ত্যাগ করে উন্মুক্ত আকাশতুল্য প্রব্রজ্যা জীবন যাপন করা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু থেকে মুক্তি লাভের লক্ষ্যে বীর্যবানগণ প্রব্রজ্যা জীবন গ্রহণ করে নির্বাণ সাধনায় আত্মনিয়োগ করে থাকেন। বৌদ্ধ সামাজিক প্রথানুসারে প্রত্যেকে জীবনের যে কোন সময় অন্তত একবার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। আজীবনের জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ সম্ভব না হলেও বৌদ্ধ নর-নারীগণ তাদের সন্তানদেরকে কমপক্ষে এক সপ্তাহের জন্য হলেও প্রব্রজ্যা দান করেন, যা বৌদ্ধদের সামাজিক রীতিতে পরিণত হয়েছে। সপ্তাহকাল হলে প্রব্রজিত হয়ে তারা বুদ্ধের ধর্মের মৌলিক আদর্শ ও পরিশুদ্ধ শীলময় জীবনযাপন করার অপূর্ব সুযোগ লাভ করেন এবং ব্রহ্মচর্য জীবনের উন্নত জীবনাদর্শ কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তাই প্রত্যেক মাতা-পিতার কর্তব্য -উপযুক্ত সময়ে তাদের সন্তানদেরকে প্রব্রজ্যা দিয়ে আদর্শ বৌদ্ধ হিসেবে গড়ে তুলতে সর্বোত্তম সহায়তা করা। প্রব্রজ্যা দানের মাধ্যমে মাতা-পিতা সন্তানকে ধর্মীয় ও নীতি আদর্শ এবং পরিশুদ্ধ জীবন যাপনের সুযোগ করে দেন। স্বল্প সময়ের প্রব্রজিত জীবন অনেকক্ষেত্রে হেতু প্রত্যয়ের কারণে পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য মহাজীবন লাভের সুযোগ এনে দেয়। তাই বলা হয় প্রব্রজ্যার অনেক গুণ, মহাগুণ ও অনন্ত গুণ, অপরিমেয় গুণ।

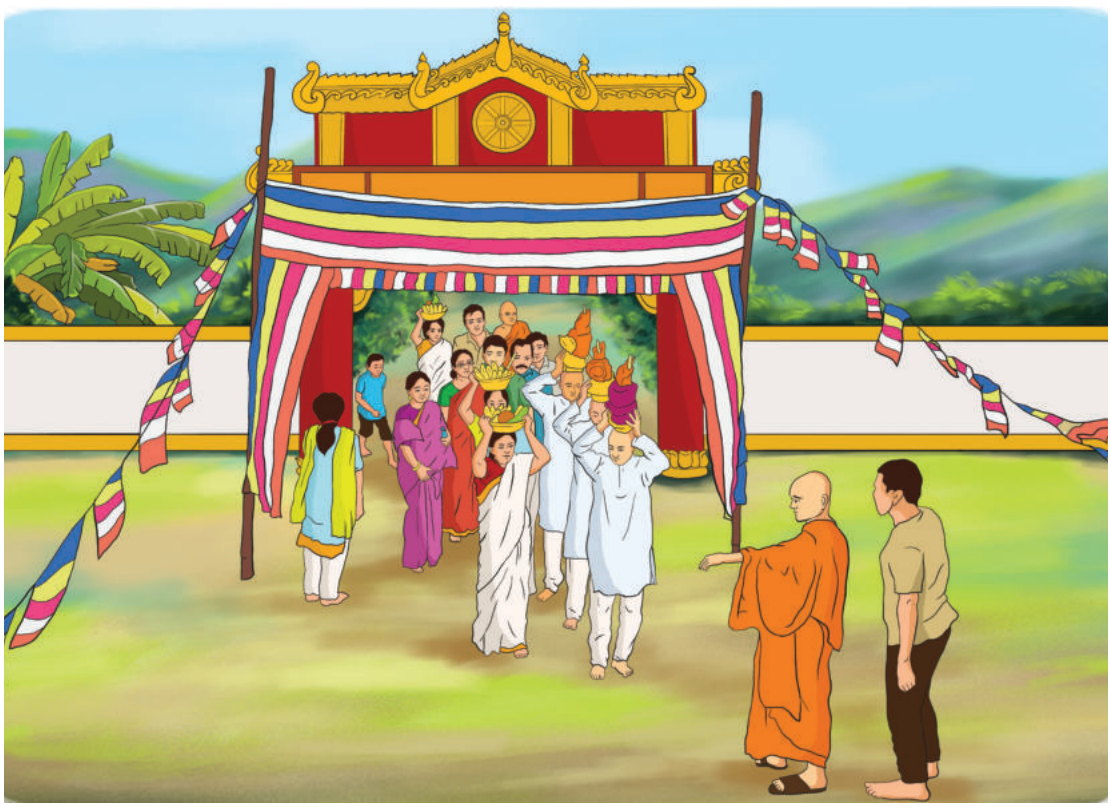

প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য শোভাযাত্রা

প্রব্রজ্যা গ্রহণের নিয়ম: প্রব্রজ্যা প্রার্থীকে প্রথমে মাতা-পিতার অনুমতি নিতে হয়। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পূর্বেই কেশ শ্মশ্রু ছেদন ও মস্তক মুন্ডন করতে হয়। মুন্ডিত মস্তকে গৃহীবস্ত্র পরিধান করে ভিক্ষু শ্রামণদের ব্যবহার্য অষ্টপরিষ্কার নিয়ে বৌদ্ধ বিহারে উপস্থিত হতে হয়। সাধারণত প্রব্রজ্যা প্রার্থীর জ্ঞাতিস্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী বৌদ্ধ সংকীর্তন বাদ্যসহকারে বিহারে উপস্থিত হয়। সাধারণত অষ্টপরিষ্কারগুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে নেয়া হয়। চীবর তিনটি ক্রমান্বয়ে গোলাকার করে মুড়িয়ে মন্দিরের চূড়ার মতো করে সাজাতে হয়। চীবরের চূড়াটি কঠিবন্ধনী দিয়ে বাঁধিতে হয়। তারপর তা ভিক্ষাপাত্রে রাখা হয়। অন্যান্য দ্রব্যগুলোও ভিক্ষাপাত্রে রাখা হয়। অষ্টপরিষ্কার ছাড়াও প্রব্রজ্যা প্রার্থী প্রব্রজ্জিত গ্রহণের সময় বা পরে ব্যবহারের জন্য বিছানাপত্র, ছাতা, সেন্ডেল ইত্যাদি দেয়ার প্রথা রয়েছে।

প্রব্রজ্যা গ্রহণবিধি: বুদ্ধের বিনয় বিধান অনুসারে ৭ বছরের কম বয়সের নির্বোধ ছেলেকে প্রব্রজ্যা দেওয়ার নিয়ম নেই। কারণ, এর চেয়ে কম বয়সের ছেলেদের পক্ষে বুদ্ধ প্রবর্তিত প্রব্রজ্যা শীলের শিক্ষাপদগুলো প্রতিপালন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। সর্বোপরি তাদের পক্ষে বিরাগ প্রধান, প্রজ্ঞা প্রধান, বুদ্ধের ধর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আবার প্রব্রজ্যা প্রদানকারী গুরু বা আচার্য যিনি হবেন তাঁকে কমপক্ষে দশ বছরের ভিক্ষু জীবন বা স্থবির ভিক্ষু হতে হয়। তাঁকে দক্ষ, সমর্থ এবং তাঁর উচ্চারণে বিশুদ্ধ হতে হয়। দশ বছরের কম বয়স্ক সুদক্ষ ভিক্ষু ও প্রব্রজ্যা প্রার্থীকে সরাসরি প্রব্রজ্যা দান করতে পারেন না এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণকারীর আচার্য উপাধ্যায়ও হতে পারেন না। তাই প্রব্রজ্যা প্রার্থীকে একজন স্থবির ভিক্ষুকেই আচার্য হিসেবে ঠিক করে নিতে হয়। তবে প্রব্রজ্যা গ্রহণকালীন যদি একাধিক স্থবির/মহাস্থবির ভিক্ষু উপস্থিত থাকেন তবে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষু আচার্য বা গুরু হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রব্রজ্যা প্রার্থীর মাতা-পিতা প্রদত্ত গৃহী নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয়। তখন থেকে তিনি নতুন নামে শ্রমণ হিসেবে পরিচিত হন।

প্রব্রজ্যা প্রার্থীকে প্রথমে ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল গ্রহণ করতে হয়। শুদ্ধভাবে সুস্পষ্টরূপে ত্রিশরণ উচ্চারণ করতে হয়। সে সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত গৃহীজন সাধারণ ও সমবেতভাবে পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। পঞ্চশীল গ্রহণের পর প্রব্রজ্যা প্রার্থী পুনরায় উৎকুটিক আসনে (পদদ্বয় সমন্বিত করে হাঁটুর ওপর হাত জোড় করে বসা) বসে ভিক্ষুসংঘের নিকট প্রব্রজ্যা শীল প্রার্থনা করেন। প্রব্রজ্যা শীলকে দশশীলও বলা হয়।

প্রব্রজ্যা প্রার্থনা: প্রব্রজ্যা প্রার্থনার সময় প্রব্রজ্যা প্রার্থীকে নির্দিষ্ট নিয়মে বসতে হয়। এরপর সংগৃহীত অষ্ট পরিষ্কার হতে গোলাকারে সজ্জিত চূড়া সদৃশ চীবরগুলো হাতে নিয়ে (উৎকুটিক আসনে বলতে হয়):

“ওকাস অহং ভন্তে পব্বজ্জং যাচ্চামি

দুতিযম্পি অহং ভন্তে পব্বজ্জং যাচ্চামি

ততিযম্পি অহং ভন্তে পব্বজ্জং যাচ্চামি

বাংলা অনুবাদ:

ভন্তে অবকাশ প্রদান করুন

আমি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করছি

দ্বিতীয় বারও ভন্তে আমি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করছি

তৃতীয় বারও ভন্তে আমি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করছি

এরপর প্রব্রজ্যা প্রার্থনার কারণ ও উদ্দেশ্যে নিচের প্রার্থনাটি করতে হয়:

সব্বদুক্খ নিস্সরণ নিব্বাণং সচ্ছিকরণত্থায ইমং কাসাবং গহেত্বা পব্বাজেথ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায।

দুতিযম্পি সব্বদুঃখ নিস্সরণ নিব্বাণং সচ্ছিকরণত্থায ইমং কাসাবং গহেত্বা পব্বাজেথ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায।

ততিযম্পি সব্বদুক্খ নিস্সরণ নিব্বাণং সচ্ছিকরণত্থায ইমং কাসাবং গহেত্বা পব্বাজেথ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায।

বাংলা অনুবাদ:

ভন্তে, সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ ও নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার জন্য অনুগ্রহ করে

এই কাষায় বস্ত্র (চীবরসহ) গ্রহণ করে আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।

দ্বিতীয়বার ভন্তে, সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ ও নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার জন্য অনুগ্রহ করে

এই কাষায় বস্ত্র (চীবরসহ) গ্রহণ করে আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।

তৃতীয়বার ভন্তে, সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ ও নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার জন্য অনুগ্রহ করে

এই কাষায় বস্ত্র (চীবরসহ) গ্রহণ করে আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।

তারপর প্রব্রজ্যা প্রার্থীকে দীক্ষাদানকারী আচার্যের হাতে চীবরসহ তুলে দিতে হয়। অতঃপর হাতজোড় করে নিচের প্রার্থনাটি করতে হয়:

দুতিযম্পি সব্বদুক্খ নিস্সরণ নিব্বাণং সচ্ছিকরণত্থায এতং কাসাবং দত্বা পব্বাজেথ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায।

ততিযম্পি সব্বদুক্খ নিস্সরণ নিব্বাণং সচ্ছিকরণত্থায এতং কাসাবং দত্বা পব্বাজেথ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায।

বাংলা অনুবাদ:

ভন্তে, সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ ও নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার জন্য অনুগ্রহ করে

এই কাষায় বস্ত্র (চীবরসহ) প্রদান করে আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।

দ্বিতীয়বার ভন্তে, সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ ও নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার জন্য অনুগ্রহ করে

এই কাষায় বস্ত্র (চীবরসহ) প্রদান করে আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।

তৃতীয়বার ভন্তে, সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ ও নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার জন্য অনুগ্রহ করে

এই কাষায় বস্ত্র (চীবরসহ) প্রদান করে আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।

অতঃপর, উপাধ্যায় শরীরের বত্রিশ প্রকার অশুভ বিষয় থেকে প্রথম পাঁচটিকে নিয়ে কর্মস্থান ভাবনা দেন। এগুলো

হলো— কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো। এটি অনুলোম প্রতিলোমাকারে উচ্চারণ করতে হয়। তারপর চীবর প্রত্যবেক্ষণ ভাবনার মাধ্যমে চীবর গ্রহণ করতে হয়। ভাবনাটি এরূপ : পটিসঙ্খা যোনিসো চীবরং পটিসেবামি, যাবদেব সীতস্স পটিঘাতায় উণ্হস্স পটিঘাতায়, ডংস-মকস-বাতাতপ-সিরিংসপ সম্ফস্সানং পটিঘাতায়, যাবদেব হিরিকোপীনং পটিচ্ছাদনত্থং।

বাংলা অনুবাদ: সজ্ঞানে মনোযোগ সহকারে স্মরণ করতে আমি এ চীবর পরিধান করেছি। এ চীবর শুধু শীত ও উষ্ণতা নিবারণ, দংশক-মশক-ধুলাবায়ু, রৌদ্র-সরীসৃপ ও বৃশ্চিকাদির আক্রমণ ও দংশন নিবারণ এবং লজ্জা নিবারণের জন্য।

এ ভাবনা গ্রহণের পর গৃহী পোশাক পরিত্যাগ করে চীবর পরিধান করা হয় চীবর পরিধান করে ভিক্ষুসঙ্ঘের সামনে এসে প্রব্রজ্যা শীল বা দশশীল প্রার্থনা করতে হয়।

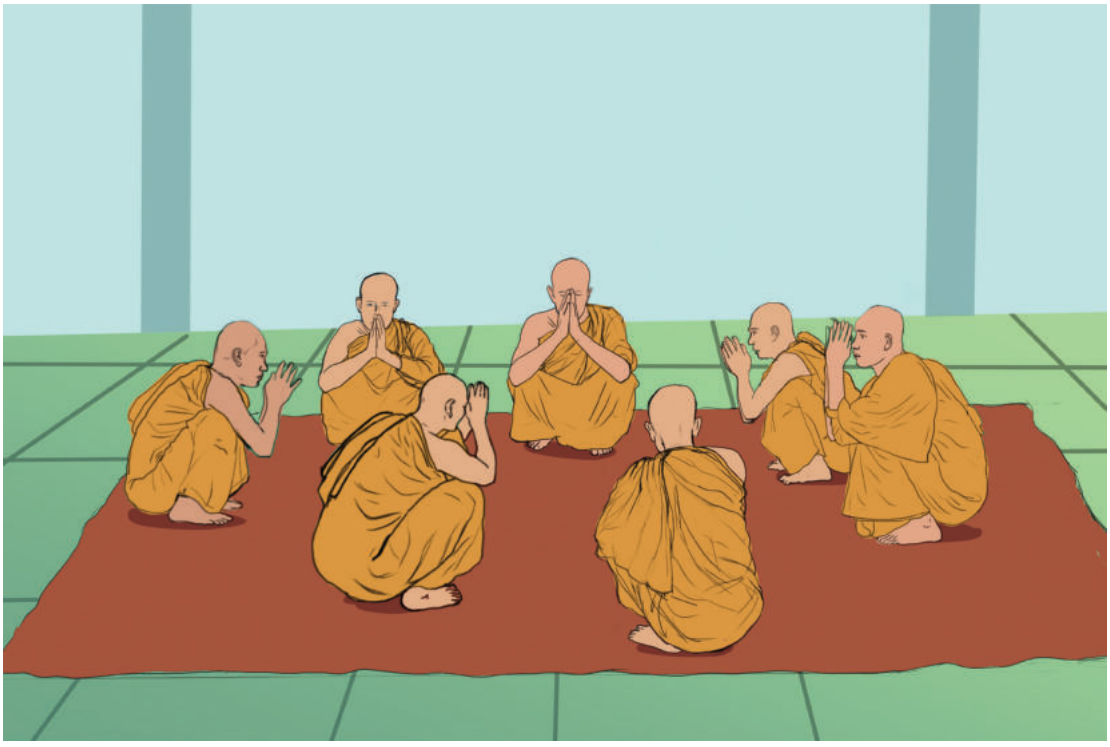

ভিক্ষুদের কম্মবাচা পাঠ

দশশীল প্রার্থনা (পালি)

ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেন সদ্ধিং পব্বজ্জা সামনের দসসীলং ধম্মং যাচামি,

অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

দুতিযম্পি অহং ভন্তে তিসরণেন সদ্ধিং পব্বজ্জা সামনের দসসীলং ধম্মং যাচামি,

অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

ততিযম্পি অহং ভন্তে তিসরণেন সদ্ধিং পব্বজ্জা সামনের দসসীলং ধম্মং যাচামি,

অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

বাংলা অনুবাদ: ভন্তে অবকাশপূর্বক সম্মতি প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ প্রব্রজ্যা দশশীল প্রার্থনা করছি। ভন্তে, দয়া করে আমাকে দশশীল প্রদান করুন।

দ্বিতীয়বার ভন্তে অবকাশ পূর্বক সম্মতি প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ প্রব্রজ্যা দশশীল প্রার্থনা করছি।

ভন্তে, দয়া করে আমাকে দশশীল প্রদান করুন।

তৃতীয়বার ভন্তে অবকাশ পূর্বক সম্মতি প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ প্রব্রজ্যা দশশীল প্রার্থনা করছি। ভন্তে, দয়া করে আমাকে দশশীল প্রদান করুন।

দশশীল (পালি)

১. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং।

২. অদিন্নদানা বেরমণী সিক্খাপদং।

৩. অব্রহ্মচরিযা বেরমণী সিক্খাপদং।

৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং।

৫. সুরা-মেরেয-মজ্জ পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং।

৬. বিকালভোজনা বেরমণী সিক্খাপদং।

৭. নচ্চ-গীত-বাদিত বিসুকদস্সন বেরমণী সিক্খাপদং।

৮. মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মন্ডন বিভুসনট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং।

৯. উচ্চসযনা মহাসযনা বেরমণী সিক্খাপদং।

১০. জাতরূপ-রজতং পটিগ্গহনা বেরমণী সিক্খাপদং।

ইমানি পব্বজ্জা সামনের দসসিক্খা পাদানি সমাদিযামি দুতিযম্পি, ততিযম্পি...।

দশশীল (বাংলা)

১. প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকব—এ শিক্ষাপদ .....

২. অদত্তবস্তু গ্রহণ (চুরি) করা থেকে বিরত থাকব— এ শিক্ষাপদ .....

৩. অব্রহ্মচর্য থেকে বিরত থাকব—এ শিক্ষাপদ .....

৪. মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকব— এ শিক্ষাপদ .....

৫. সুরা এবং মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকব— এ শিক্ষাপদ .....

৬. বিকেল বেলা ভোজন থেকে বিরক থাকব— এ শিক্ষাপদ .....

৭. নাচ-গান-বাদ্যযন্ত্রের উৎসব দর্শন করা থেকে বিরত থাকব— এ শিক্ষাপদ .....

৮. মালাধারণ, সুগন্ধিদ্রব্যের প্রলেপ, অলংকার গ্রহণে থেকে বিরত থাকব— এ শিক্ষাপদ .....

৯. উচ্চশয্যা ও মহাশয্যা (অত্যন্ত আরামদায়ক শয্যা) থেকে বিরত থাকব— এ শিক্ষাপদ .....

১০. সোনা-রুপা বা মুদ্রা আদান-প্রদান ও গ্রহণ থেকে বিরত থাকব— এ শিক্ষাপদ .....

উপরোক্ত শ্রামণের দশশীলসমূহের শিক্ষাপদগুলো আমি গ্রহণ করছি এবং যথাযথভাবে পালন করব দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার।

দশশীল গ্রহণের পর প্রব্রজ্যা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। দশশীল হলো প্রব্রজিতদের নিত্য পালনীয় দশটি নিয়ম। এরপর প্রব্রজিত শ্রমণকে নতুন নাম প্রদান করা হয়। প্রব্রজিত ব্যক্তি যতদিন দীক্ষিত অবস্থায় থাকেন, ততদিন এ নামে পরিচিত হন। এ প্রব্রজ্যা দশশীল শ্রমণের বা তারপর আচার্য বা শিক্ষাগুরু তাকে ৭৫ সেখিয়া চারি প্রত্যবেক্ষণ দৈনিক চর্যাসহ শ্রমণের করণীয় ধর্মসমূহ শিক্ষাদান করবেন। প্রব্রজ্যা দান সম্পন্ন হলে উপস্থিত দায়ক-দায়িকাগণ প্রব্রজিতকে অভিবাদন জানিয়ে নানা দ্রব্যসামগ্রী দান করেন। প্রব্রজ্যা কার্যক্রমের প্রতিটি পর্যায় ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন করতে হয়, যাতে প্রব্রজ্যা প্রার্থীর কাছে প্রতিটি ধাপের পরিবর্তন সহজে বোধগম্য হয়। এভাবে প্রব্রজ্যা প্রার্থী তাঁর জীবনের পরিবর্তন যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হন।

প্রব্রজ্যার সুফল

প্রব্রজ্যা একপ্রকার বিশুদ্ধ জীবনচর্চার ব্রত। এটিকে মুক্ত জীবনও বলা যায়। ব্রত গ্রহণের জন্য প্রথমে নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হয়। কারণ এ জীবন সাধারণ জীবনধারা থেকে ব্যতিক্রম। নির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে অতিবাহিত করতে হয় দৈনন্দিন জীবন। প্রব্রজিতদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এগুলো শারীরিক ও মানসিকভাবে পালন করতে হয়। তাঁদের নৈতিক জীবনযাপন ও সর্বদা কুশল কর্ম সম্পাদনে সচেষ্ট থাকতে হয়। সকল প্রকার পাপকর্ম হতে বিরত থাকতে হয়। নির্বাণ লাভের জন্য উদ্যমী হতে হয়। ফলে প্রব্রজিতের জীবন পঙ্কিলতামুক্ত থাকে। তিনি নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান থাকেন। নির্মল আনন্দের অধিকারী হন। এসব গুণের জন্য সকলের শ্রদ্ধা লাভ করেন। এছাড়া প্রব্রজ্যার অনেক সুফল রয়েছে।

নিচের প্রব্রজ্যার কতিপয় সুফল বর্ণিত হলো—

১. কায়, বাক্য ও মনোদ্বার সংযত হয়।

২. রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রশমিত হয়।

৩. অকুশল কর্মচেতনা বিনাশ হয়।

৪. কুশলকর্ম সম্পাদনে ব্রতী হন।

৫. অল্প লাভে সন্তুষ্ট থাকেন।

৬. জ্ঞান সাধনায় প্রত্যয়ী হন।

৭. ভিক্ষুজীবন গ্রহণে আগ্রহী হন।

৮. দুর্গতির পথ বন্ধ হয় এবং সুগতিপ্রাপ্ত হন।

৯. বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্ব জানা ও চর্চার সুযোগ হয়।

১০. বিপুল পুণ্য সম্পদের অধিকারী হন।

১১. জীবন নিয়ন্ত্রিত এবং আসক্তিমুক্ত হয়।

১২. নির্বাণ পথের অনুগামী হন।

এছাড়া প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের মাধ্যমে অন্যদেরও ধর্মীয় চেতনাবোধ জাগ্রত হয়। প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক চেতনাও বিকশিত হয়। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পূর্বাহ্নে আনন্দ শোভাযাত্রা হয়। এ সময় ভক্তিমূলক গান, বুদ্ধকীর্তন ও জয়ধ্বনি করা হয়। সকল বয়সের নারী-পুরুষ শ্রদ্ধাচিত্তে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এর মাধ্যমে প্রব্রজ্যা প্রার্থীকে অভিনন্দিত করা হয়। আবার যারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, প্রব্রজ্যা ত্যাগের পর তাঁদের পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয়। এটি হলো কিছুদিন বিশুদ্ধ জীবনাচার অনুশীলনের সম্মাননা বা কৃতজ্ঞতা। সুশৃঙ্খল জীবন গঠনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় প্রত্যেক বৌদ্ধের জীবনে কিছুদিন হলেও এই প্রব্রজ্যাব্রত গ্রহণ করা উচিত। এই ব্রত গ্রহণ ছাড়া প্রব্রজ্যা জীবনের বিশুদ্ধতা, আদর্শ ও উৎকর্ষ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, সন্তানকে প্রব্রজ্যা দান ব্যতীত বৌদ্ধধর্মের উত্তরাধিকারী হওয়া যায় না। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তিনি চুরাশি হাজার ধাতুচৈত্য ও চুরাশি হাজার বিহার মহা উৎসবের সঙ্গে দান করে ভিক্ষুসঙ্ঘকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— 'মাননীয় সঙ্ঘ। বুদ্ধ শাসনে শ্রেষ্ঠ দাতা কে? কার দান অধিক? উত্তরে ভিক্ষুসংঘ বলেন, 'মহারাজ! আপনিই শ্রেষ্ঠ দাতা। আপনার মতো দান আর কেউ করেননি। আপনার দান সর্বাপেক্ষা অধিক!' এ কথা শুনে সম্রাট অশোক খুবই প্রীতি অনুভব করেন। আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল হয়ে তিনি পুনরায় ভিক্ষুসঙ্ঘকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ভন্তে'! আমি বুদ্ধশাসনের উত্তরাধিকারী হতে পেরেছি কি?' তখন ভিক্ষুসঙ্ঘের সম্মতি ক্রমে মোগ্গলীপুত্র তিষ্য স্থবির বলেন, 'মহারাজ! আপনি ভিক্ষুসঙ্ঘের ভরণ-পোষণের দাতা মাত্র। কেউ যদি ব্রহ্মলোকে পর্বত প্রমাণ স্তূপ করে ভিক্ষুসঙ্ঘকে বিবিধ দানীয়বস্তু দান করে, তিনি উদার দায়ক হন মাত্র, বুদ্ধশাসনের উত্তরাধিকারী হতে পারেন না। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে যিনি স্বীয় পুত্রকে প্রব্রজিত করে বুদ্ধশাসনে দান করেন, তিনিই কেবল বুদ্ধশাসনের উত্তরাধিকারী হন। এ কথা শুনে সম্রাট অশোক উৎকণ্ঠিত হয়ে বলেন, আমি এত দান করার পরও বুদ্ধশাসনের উত্তরাধিকারী হতে পারলাম না। অতঃপর তিনি পুত্র-কন্যার সম্মতি নিয়ে তাঁদেরকে প্রব্রজিত করে সঙ্ঘ দান করেন এবং বুদ্ধশাসনের উত্তরাধিকারী হন। বলা বাহুল্য, তাঁর ভিক্ষুপুত্র অর্হৎ মহেন্দ্র স্থবির এবং কন্যা ভিক্ষুণী সংঘমিত্রা শ্রীলংকায় ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে বৌদ্ধধর্মকে চিরজীবী করে রেখে গেছেন। প্রব্রজ্যার সুফল সম্পর্কে আরো বলা হয়ে থাকে যে, জম্বুদ্বীপের সর্বত্র বিহার নির্মাণ করিয়ে দান করলে, যে ফল লাভ হয়, তা বুদ্ধশাসনে সন্তানকে প্রব্রজিত করে দান করলে সে ফলের ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না। উল্লেখ্য, ভারতীয় উপমহাদেশ সে সময় জম্বুদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল।

শিক্ষার্থীরা একজন পূজনীয় ভিক্ষুর সাক্ষাৎকার নিচ্ছে

উপসম্পদা

শ্রমণ থেকে ভিক্ষু হওয়ার যে অনুষ্ঠান, তার নাম উপসম্পদা। উপসম্পদা হচ্ছে উচ্চতর নিয়ম-নীতি সম্পাদনের ব্রত। প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয় সমাপ্তির পর উপসম্পদা দিতে হয়। মানসিকভাবে অসুস্থ, ঋণগ্রস্ত, রাষ্ট্রীয় দণ্ডপ্রাপ্ত প্রভৃতি ব্যক্তি উপসম্পদার যোগ্য নয়। বিনয় পিটকের অর্থকথা সামন্ত পাশাদিকা অনুসারে আট প্রকার উপসম্পদা ১. সরণ গমন উপসম্পদা, ২. ওবাদ পটিগ্গহন উপসম্পদা, ৩. এহি ভিক্ষু উপসম্পদা, ৪. পঞ্ঞা ব্যাকরণ উপসম্পদা, ৫. গুরুধম্ম পটিগ্গহন উপসম্পদা, ৬. দুতেন উপসম্পদা, ৭. অর্থ বাচিকা উপসম্পদা এবং ৮. ঞতিচতুত্থ কম্ম উপসম্পদা। বর্তমানে শুধু ঞতিচতুত্থ কম্ম উপসম্পদা প্রচলিত আছে। অন্যান্য উপসম্পদা প্রচলিত নেই, কোনো গৃহী ব্যক্তিকে যায় সরাসরি উপসম্পদা প্রদান করা হয় না। আগে প্রব্রজিত হয়ে শ্রামণধর্মে দীক্ষিত হতে হয়। উপসম্পদার জন্য কমপক্ষে বিশ বছর বয়স হতে হয়। উপসম্পদা প্রার্থীকে মাতা-পিতার অনুমতি নিতে হয়। অতঃপর ভিক্ষুদের ব্যবহার্য অষ্টপরিষ্কার নিয়ে কোনো ভিক্ষুর শরণাপন্ন হতে হয়। সেই ভিক্ষুই সাধারণত তাঁর উপাধ্যায় বা গুরু হন। ভিক্ষুদের উপোসথের স্থান ভিক্ষুসীমায় বসে উপসম্পদা কার্য সম্পন্ন করতে হয়। কোনো বিহারে ভিক্ষুসীমা না থাকলে, যে নদী বা খালে জোয়ার-ভাটা হয়, সেখানেও উপসম্পদা দেওয়া যায়। এখানে নৌকায় বসে বা প্রস্তুতকৃত ওধক সীমায় করণীয় সম্পন্ন করতে হয়। এর নাম 'উদকসীমা'। উপসম্পদার জন্য কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুর প্রয়োজন হয়। প্রথমে প্রার্থীকে উপরে বর্ণিত দোষসমূহ আছে কি না জিজ্ঞেস করা হয়। তারপর অভিভাবকের মতামতের কথা জেনে উপসম্পদার অনুমতি প্রদান করা হয়। উপসম্পদা প্রার্থীকে উপসম্পদা প্রদান স্থানে বসে উপস্থিত ভিক্ষুদের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে উপসম্পদা প্রার্থনা করতে হয়। প্রার্থনাটি নিম্নরূপ:

সঙ্ঘং ভন্তে উপসম্পদং যাচামি, উল্লম্পতু মং ভন্তে সংঘো-অনুকম্পং উপাদায।

দুতিযম্পি সঙ্ঘং ভন্তে উপসম্পদং যাচামি, উল্লম্পতু মং ভন্তে সংঘো-অনুকম্পং উপাদায।

ততিযম্পি সঙ্ঘং ভন্তে উপসম্পদং যাচামি, উল্লম্পতু মং ভন্তে সংঘো-অনুকম্পং উপাদায।

বাংলা অনুবাদ: মাননীয় সঙ্ঘ, আমি উপসম্পদা প্রার্থনা করছি। উচ্চতর মার্গ লাভের জন্য অনুগ্রহ করে আমাকে উপসম্পদা দিন।

দ্বিতীয়বার সঙ্ঘ, আমি উপসম্পদা প্রার্থনা করছি। উচ্চতর মার্গ লাভের জন্য অনুগ্রহ করে আমাকে উপসম্পদা দিন।

তৃতীয়বার সঙ্ঘ, আমি উপসম্পদা প্রার্থনা করছি। উচ্চতর মার্গ লাভের জন্য অনুগ্রহ করে আমাকে উপসম্পদা দিন।

'উদকসীমা'য় উপসম্পদা

এরপর উপস্থিত সঙ্ঘ সকলের সম্মতি সাপেক্ষে ঞতি চতুর্থ কর্মবাচা পাঠ করে প্রার্থীকে উপসম্পদা প্রদান করেন। কর্মবাচা হলো ভিক্ষুর কর্মনীতির একটি অংশ। এর মাধ্যমে উপসম্পদা লাভকারী ভিক্ষু হিসেবে পরিচিত হন এবং সঙ্ঘের সদস্য হন। উপসম্পদা লাভের পর হতে নিয়মিতভাবে ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য অনুশীলনীয় ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষে বর্ণিত দুইশত সাতাশ শীলসহ অন্যান্য ব্রতাদি পালন করতে হয়। উপসম্পদা প্রদান কালীন কর্মবাচা পাঠের সময় তাকে চারিটি নিস্সয় বা আশ্রয় এবং চারটি ভিক্ষু শ্রামণদের অকরণীয় কর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত করানো হয়। চারটি নিস্সয় হলো: ১. পিন্ডিযালোপ ভোজনং যাবজীবং উস্সাহ করণিয়ো অর্থাৎ ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবন প্রতিপালনে উৎসাহী হতে হবে, ২. পংশুকুলিক চীবরং যাবজীবং উস্সাহ করণিয়ো অর্থাৎপাংশুকুলিক চীবর পরিধান করে জীবন পরিচালনায় যাবজ্জীবন উৎসাহী হতে হবে, ৩. রুক্খমুলং সেনাসনং যাবজীবং উস্সাহ করণিয়ো–বৃক্ষমূলে শয্যাগ্রহণে যাবজ্জীবন উৎসাহী থাকা, ৪. পুতিমুত্তং ভেসজং যাবজীবং উস্সাহ করণিয়ো–গোমূত্র, ত্রিফলাদি ঔষধি হিসেবে সেবনে যাবজ্জীবন উৎসাহী থাকতে হবে। চারটি অকরণীয় কর্ম হলো, ২২৭ শীলের মধ্যে চারি পারাজিকা কর্ম থেকে আজীবন বিরত থাকা।

১. ব্যভিচার থেকে বিরতি।

২. পরদ্রব্য অপহরণ থেকে বিরতি।

৩. গর্ভপাত ও মনুষ্য হত্যা থেকে বিরতি।

৪. লাভ-সৎকারের আশায় মিথ্যা কুহক প্রতারণা ও অলৌকিক ঋদ্ধি প্রদর্শনে বিরতি।

নব উপসম্পদা সম্পন্ন ভিক্ষু আচার্য বা গুরুর কাছে নিয়মিতভাবে ধর্ম বিনয় শিক্ষা করেন। প্রয়োজনে গুরুর অনুমতি সাপেক্ষে উপযুক্ত অন্য আচার্যের অধীনেও শিক্ষা লাভ করতে পারেন। একজন ভিক্ষুকে উপাধ্যায় ও আচার্যের কাছে শিক্ষানুরাগী হয়ে কমপক্ষে পাঁচ বছর থাকতে হয়। এ সময় তিনি ভিক্ষুদের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতিসমূহ চর্চা করেন। পাতিমোক্খ নামক গ্রন্থে ভিক্ষুদের নিত্যা প্রতিপাল্য ২২৭টি শীল বা অনুশীলনীয় নীতি বর্ণিত আছে। এগুলো প্রতিটি যথাযথভাবে ভিক্ষুদের জানতে ও পালন করতে হয়।

প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার মধ্যে পার্থক্য:

ধর্মীয় বিধান মতে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নি, স্ত্রী-পুত্র পরিবার বিশিষ্ট গৃহ ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বনের নাম প্রব্রজ্যা। নিজের পাপমল প্রক্ষালন বা ত্যাগ করেন বলে প্রব্রজ্যা অবলম্বনকারীদের প্রব্রজিত বলা হয়। দশ শীলধারী প্রব্রজিতদের বলা হয় শ্রামণের বা শ্রমণ। শ্রমণের বয়স বিশ বছর পূর্ণ হলে প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন বা ব্রতাদি শিক্ষার পর তাঁকে উপসম্পদা দেয়া হয়। শ্রমণ হতে ভিক্ষুত্বে উন্নীত করার জন্য যে অনুষ্ঠান হয় তাকে বলা হয় উপসম্পদা। বৌদ্ধ সংঘ প্রতিষ্ঠার সময়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হতো না। কোনো ব্যক্তি প্রব্রজ্যা প্রার্থী হলে বুদ্ধ নিজেই তাকে "এহি ভিক্খু" বলে সংঘভুক্ত করে নিতেন। ভিক্ষুদেরও বুদ্ধ নির্দেশ দিয়েছিলেন ত্রিশরণ ও দশশীল দিয়ে প্রব্রজিত করিয়ে সংঘভুক্ত করে নেওয়ার। পরবর্তীতে বুদ্ধ আট প্রকার উপসম্পদা গ্রহণের পদ্ধতি উল্লেখ করেন। বর্তমান সময়ে এক প্রকার উপসম্পদা পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যার নাম ঞতি চতুত্থ কম্মবাচা উপসম্পদা।

সাত বছর বয়স হলেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা যায় কিন্তু পরিপূর্ণ বিশ বছর না হলে একজন শ্রমণ উপসম্পদা গ্রহণ বা ভিক্ষু হতে পারেনা। একজন প্রবীণ বা স্থবির ভিক্ষু যে কোনো কুলপুত্রকে প্রব্রজিত করাতে পারে। সংঘের উপস্থিতি ব্যতীত কোন শ্রমণকে উপসম্পদা দেওয়া যায় না। যে কোনো স্থানে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারে। পবিত্র ভিক্ষু সীমা ব্যতীত উপসম্পদা গ্রহণ করা যায় না। একজন গৃহী বা কুলপুত্র গৃহী অবস্থা থেকে সরাসরি উপসম্পদা নিতে পারে না। তাঁকে আগে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে শ্রমণ হতে হয়। শ্রমণেরা দশশীল প্রতিপালন করে এবং পঁচাত্তর সেখিয়া ধর্ম শিক্ষা করে। উপসম্পদা প্রাপ্ত ভিক্ষুকে ২২৭ শীর পালন করতে হয় এবং বহুবিধ ব্রত পালন করতে হয়। ভিক্ষু মাত্রই সংঘেরসদস্যভুক্ত । এক্ষেত্রে শ্রমণ সংঘভুক্ত সদস্য নয়; শিক্ষার্থী মাত্র। ভিক্ষুদের সংঘকর্মাদিতে যোগ দিতে হয় কিন্তু শ্রমণকে যোগ দিতে হয় না। এক্ষেত্রে শ্রমণ সংঘের সেবক মাত্র।

উপসম্পদার সময় ভিক্ষুসংঘ ঞতি চতুত্থ কম্মবাচা পাঠের মাধ্যমে একজন শ্রমণকে উপসম্পদা দান করে। প্রব্রজিত করার সময় শুধু ত্রিশরণসহ দশশীর প্রদান করা হয়।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ১২

প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রাপ্ত একজন ভিক্ষুর সচিত্র কেস স্টাডি রিপোর্ট লিখে আনো।

কেস স্টাডি রিপোর্টে কী কী বিষয় থাকবে তা তোমার শিক্ষক থেকে জেনে নাও।

নির্দেশনা

কেস স্টাডি রিপোর্ট

ভিক্ষুর ছবি

ভিক্ষুর নাম.....

ভিক্ষুর বসবাসেরর স্থান .....

তিনি কোন বয়সে প্রব্রজ্যাপ্রাপ্ত হয়েছেন? .....

কী কী নিয়ম পালন করার পর প্রব্রজ্যাপ্রাপ্ত হয়েছেন? .....

প্রব্রজ্যাপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য তিনি কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন?.....

কোন কোন বিষয় তাকে প্রব্রজ্যাপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে? .....

প্রব্রজ্যাপ্রাপ্তির অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল? .....

তিনি কোন বয়সে উপসম্পদাপ্রাপ্ত হয়েছেন? .....

কী কী নিয়ম পালন করার পর উপসম্পদাপ্রাপ্ত হয়েছেন? .....

কোন কোন বিষয় তাকে উপসম্পদাপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে? .....

উপসম্পদাপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য তিনি কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন? .....

উপসম্পদাপ্রাপ্তির অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল? .....

* ভিক্ষুর প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদাপ্রাপ্তির অনুষ্ঠানের কোনো স্থির চিত্র থাকলে কেস স্টাডির প্রতিবেদনে যুক্ত করতে পারো।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৩

কেস স্টাডি রিপোর্ট তৈরির অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে তোমার লিখিত মতামত দাও
কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)?
কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)?
সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?

ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)?

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

ফিরে দেখা: নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে এবং না হলে না এর ঘরে (✓) চিহ্ন দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না

পারমী

এই অধ্যায়ের পাঠ শেষে আমরা ধারণা নিতে পারব—

- পারমী বলতে কী বোঝায়;
- পারমীর সংখ্যা;
- পারমীর অনুশীলন রীতি;
- পারমী অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা;
- থেরবাদ ও মহাযান বৌদ্ধ দর্শনে পারমী।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৪

প্রিয় শিক্ষার্থী, আজকে আমরা একটি খেলা খেলব। খেলাটির নাম হলো গুপ্তধন অনুসন্ধান।

তোমার বিদ্যালয়েই শিক্ষক ১০টি গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছেন। চলো একক/দলীয়ভাবে গুপ্তধনগুলো খুঁজে বের করি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৫

গুপ্তধন অনুসন্ধান খেলার অভিজ্ঞতাটি নিচে লিখে ফেলি।

অভিজ্ঞতা

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

তোমরা যে গুপ্তধন পেয়েছ, সেগুলো হলো পারমী। জীবনের পূর্ণতা লাভের জন্য এই দশটি পারমী খুব প্রয়োজন।

আমরা সকলেই সুন্দর ও সফল জীবন চাই। যে জীবনে দুঃখ-কষ্ট, বেদনা ও আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। আনন্দময় হবে প্রতিটি ক্ষণ। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হবে অকৃত্রিম অন্তরঙ্গ ও প্রীতিপূর্ণ। এ রকম পরিপূর্ণ জীবনই সফল ও সার্থক জীবন। মানুষের সফলতার প্রকাশ হয় তার কর্মে। এর মাধ্যমে মানুষের যশ, খ্যাতি ও গৌরবও বিকাশ লাভ করে। এরকম জীবন সকলেরই প্রত্যাশিত। কিন্তু অনায়াসে এ রকম জীবন অর্জন সম্ভব নয়। এ জীবন গঠনের জন্য যেমন পরিশ্রম করতে হয়, তেমনি লক্ষ্য অর্জনে হতে হয় অধ্যবসায়ী ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বৌদ্ধ দর্শনমতে বুদ্ধত্ব লাভের জন্য অত্যন্ত কঠিন কঠোর নীতি পালন করতে হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে এরকম লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়াকে বলে পারমী। পারমী বহু জন্মের সাধনার মাধ্যমে অর্জিত হয়। এটি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি।

পারমী

পারমী শব্দের সরল অর্থ হলো পূর্ণতা। আর পূর্ণতা মানে সকল প্রকার তৃষ্ণার ক্ষয় সাধন করে বিশুদ্ধ জীবনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছা। ক্লেশমুক্ত জীবনের সাফল্যে বিভূষিত হওয়া। মহৎ গুণ ও উৎকর্ষের পরম শীর্ষস্থান লাভ করা। এ ছাড়া পাড়ে যাওয়া অর্থেও পারমী বলা হয়। পাড় মানে নদীর পাড় বা তীর। এই জগৎ সংসার দুঃখ ও যন্ত্রণার সাগর। আমরা সকলেই নানাবিধ যন্ত্রণা নিয়ে এই সাগরেই ভাসছি। এখানে সাগর হলো একটি রূপক শব্দ। জীবনের অন্তহীন সমস্যার প্রতিশব্দ এটি। এই দুঃখময় সংসার সাগর থেকে সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে জীবন পরিচালনা করে নিজের জীবনকে সৎ কর্ম ও সাধনায় পূর্ণতা দিতে পারলেই প্রকৃত মুক্তি সম্ভব হয়। এই দুঃখ মুক্তির পথ অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টসাধ্য। তা সত্ত্বেও অনেক মুনি-ঋষি এই পথ অনুশীলন করেন এবং অনেকে পূর্ণতাও লাভ করেন। এই পারমী পরিক্রমায় পূর্ণতা অর্জনকারী ব্যক্তিই হন বিশুদ্ধ ব্যক্তিত্ব।

বৌদ্ধ দর্শনে পারমী একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। পারমী সাধারণত ভবিষ্যৎ জীবনে বুদ্ধত্ব অর্জনের মহৎ অভিপ্রায়ে অনুশীলন করা হয়। এটি যিনি পালনে ব্রতী হন, তাঁকে বলা হয় বোধিসত্ত্ব। এ পারমী একটি অনুশীলনীয় তত্ত্ব; জন্ম-জন্মান্তরে পণবদ্ধ হয়ে সম্পাদনীয় একটি প্রক্রিয়া। এ তত্ত্বের গুরুত্ব অনুধাবন হয় জীবন চর্যার মাধ্যমে। সে নিরিখে পারমী প্রক্রিয়াকে একটি উন্নত নৈতিক জীবন প্রক্রিয়াও বলা যায়। চিত্ত ও কায় সংযোগে ব্রত বা প্রত্যয়ের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। তাই পারমী হলো একধরনের ব্রত বা পণবদ্ধ কর্মানুশীলনী অভিযাত্রা।

শিক্ষার্থীরা মাঠের ঝোপে গোপন বক্স খুঁজছে

পারমীর সংখ্যা

বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন বিধিমতে পারমী দশটি। অনুশীলন কার্যক্রমে এগুলো একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক রয়েছে। একটি অনুসরণে কোনো কারণে ব্যত্যয় হলে অন্যটি পালনেও এই দুর্বলতার প্রভাব পড়ে। এটি হাতের মুষ্টিবদ্ধতার মতো। একটি আঙুল বাদ দিলে যেমন মুষ্টি শক্ত হয় না, ঠিক তেমনি দশ পারমীর কোনো একটি অনুসরণে ব্যর্থ হলে অন্যটি পালন করার দৃঢ়তা হ্রাস পায়। এই পারমীগুলো সাধনাকারীর লক্ষ্য অর্জনের মার্গকে শানিত করে। অনুক্রমিক ধারায় এ পারমীগুলো পালন করতে হয়। অতীতের সকল বুদ্ধ বোধিসত্ত্বকালীন এই পারমীর অধিষ্ঠানব্রত পূর্ণ করেছিলেন। শুধু সম্যক সম্বুদ্ধ নয়, তাঁদের অনুগামী শ্রাবকবুদ্ধ ও প্রত্যেক বুদ্ধও এ পারমী ব্রত পূর্ণতার সাধনা সম্পাদন করেছিলেন।

নিচে দশ পারমীর নাম উল্লেখ করা হলো—

১. দান পারমী

২. শীল পারমী

৩. নৈষ্ক্রম্য পারমী

৪. প্রজ্ঞা পারমী

৫. বীর্য পারমী

৬. ক্ষান্তি পারমী

৭. সত্য পারমী

৮. অধিষ্ঠান পারমী

৯. মৈত্রী পারমী

১০. উপেক্ষা পারমী

পারমী অনুশীলনের পর্যায়

তোমরা ইতিমধ্যে জেনেছ, পারমী হলো নিজেকে বিশুদ্ধ করার প্রক্রিয়া। এই বিশুদ্ধিতা হলো আচরণ ও মনোজগতের। মানুষের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে তার চিন্তা-ভাবনার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। প্রকৃত অর্থে মানুষ যা ভাবে বা চিন্তা করে, সেটিই তার আচরণে প্রকাশ পায়। তাই একজন বিশুদ্ধ মানুষ বলতে তাঁকেই বোঝায়, যিনি ব্যবহারে, কথায় ও চিন্তায় বিশুদ্ধ। এই বিষয়গুলো মানুষকে অর্জন করতে হয়। এর জন্য শ্রম, সাধনা প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, দায়বদ্ধ হয়েই এটি অনুশীলন করতে হয়। পারমী তেমনি একটি নিত্য পালনীয় ও অনুসরণীয় বিষয়। অনুশীলনীয় পারমীর মূল ধাপ দশটি। প্রতিটি পারমী অনুশীলিত হয় তিন পর্যায়ে; অনুক্রমিকভাবে। যেমন: পারমী, উপ-পারমী ও পরমার্থ পারমী। সে হিসাবে দশ পারমী অনুশীলনের ক্ষেত্রে ত্রিশ পর্যায় বা ধাপে পরিণত হয়।

এখানে প্রতিটি পারমী অনুশীলনের প্রাথমিক পর্যায়। উপ-পারমী হলো মধ্যম ও পরমার্থ পারমী হলো চূড়ান্ত পর্যায়। এগুলো ধারাবাহিকভাবে অনুসরণের উর্ধ্ব দিকে যাত্রা। পারমী অনুশীলনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বা পণবদ্ধ হলেই ক্রমে ধাপ অতিক্রম সম্ভব হয়।

দশ পারমীর পরিচয়

দশ পারমীর মধ্যে প্রতিটির স্বতন্ত্র রূপ ও পরিচয় আছে। আচরণের দিক থেকে একটি পারমী অন্যটির সঙ্গে কিছুটা সম্পর্ক থাকলেও লক্ষ্য ও মূল্যবোধ ভিন্ন। একেকটির পৃথক পৃথক আবেদন রয়েছে। অনুসরণের ক্ষেত্রে সেই বিষয়গুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত থাকতে হয়। তাই প্রতিটি পারমীর পরিচয় জানা আবশ্যক। নিচে দশ পারমীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো।

দান পারমী

দশ পারমীর প্রথমটি হলো দান পারমী। দানে চিত্ত জাগ্রত হলে প্রসন্নভাবের সৃষ্টি হয়, সেই প্রসন্ন চিত্তে জাগে শীল, সমাধি, শ্রদ্ধা, মৈত্রী, করুণা ইত্যাদি সদ্ চৈতন্য জাগে। যার মাধ্যমে অন্যান্য পারমী পালনে চিত্ত প্রসারিত হয়। স্বাভাবিকভাবে দান কর্ম অনুশীলন সহজ। এই কার্যক্রম সব সময় চর্চা করা যায়।

সাধারণত বাহ্যিক বস্তু দানকে দান উপ-পারমী বলা হয়। বাহ্যিক বস্তু বলতে বোঝায় নিজের অধীনস্থ সম্পত্তি। অর্থাৎ, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দানই হলো দান পারমী। নিজের শরীরের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও রক্তদানকে বলা হয় দান উপ-পারমী। প্রয়োজনে জীবন দান করাকে পরমার্থ পারমী বলা হয়।

শীল পারমী

আচরণে, কথায় ও চিন্তায় সংযমশীলতার অনুসরণই শীল। শীল হলো মানুষের সকল গুণ সম্ভারের উৎস। সচ্চরিত্র, সদাচার, গুণাচার ও সংযমশীলতার অনুশীলনই শীল। নৈতিক আদর্শে সুদৃঢ় থাকাই হলো শীলের লক্ষণ। আচরণের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রকার শীল আছে। সেগুলোর বিভিন্ন নামও রয়েছে। এর মধ্যে চারিত্রশীল ও বারিত্রশীল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিজে অনুপ্রাণিত হয়ে পালন করা নিয়ম-নীতিই হলো চারিত্রশীল। আর বিধিবদ্ধ শিক্ষাপদ বা নীতি অনুশীলন হলো বারিত্র শীল। দান পারমীর মতো শীল পারমীর তিনটি পর্যায়ে রয়েছে যেমন: প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে দৈনন্দিন জীবনে শীল পালন হলো শীল পারমী। জীবনে কোনো কিছুর বিনিময়ে শীল বিচ্যুত না হওয়ার সংকল্পবদ্ধ থাকাই হলো শীল উপ পারমী। এছাড়া শীল পালনের প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়াকে বলে পরমার্থ পারমী। প্রত্যেক পারমীই এরকম ত্রিমাত্রিক পর্যায়ে অনুশীলিত হয়।

নৈষ্ক্রম্য পারমী

নৈষ্ক্রম্য শব্দের উদ্ভব নিষ্ক্রমণ থেকে। যার অর্থ ত্যাগ, বন্ধন ত্যাগ, বিদায় ইত্যাদি। জগতের সমস্ত ভোগ-বিলাস ও অহংকার-অহমিকা থেকে বিদায়। নৈষ্ক্রম্য জীবনাচারের আদর্শ হলো কল্যাণমুখী মানসিকতায় নিজেকে গড়ে তোলা। সকল প্রকার অন্যায় ও দুরাচার থেকে বিরত থাকা। লোভ, হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা থেকে দূরে থাকা। নৈষ্ক্রম্য সাধনার চূড়ান্ত অবস্থান ব্রহ্মচর্য। প্রাথমিকভাবে ভদ্রতা, নম্রতা, সততা ও সংযম রক্ষার প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে এই সাধনার সূচনা করতে হয়।

প্রজ্ঞা পারমী

প্রজ্ঞা মানে জ্ঞান; সম্যক জ্ঞান। অর্থাৎ, জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিত্তকে বলে প্রজ্ঞা। সুতরাং কোনো বিষয়কে প্রকৃষ্টরূপে জানার জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে যে জ্ঞান সাধনা করা হয়, তাকেই প্রজ্ঞা পারমী বলে। এটি দশ পারমীর চতুর্থ

পর্যায়। প্রজ্ঞা পারমীর চর্চায় মানুষের সম্যক জ্ঞান লাভের ধারা শানিত হয়। অন্য সকল পারমীর অনুশীলনেও প্রজ্ঞা পারমীর প্রভাব রয়েছে। এখানে সম্যক জ্ঞান বলতে মূলত নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ভালো-মন্দ ও কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কে সঠিক বিবেচনাকে বোঝায়; যা মানুষের চিন্তা ও পরিকল্পনায় সর্বতোভাবে সক্রিয় থাকে।

বলাবাহুল্য, মানুষের ধর্মীয় জীবন ও পারিবারিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রজ্ঞা সাধনার গুরুত্ব রয়েছে। আধ্যাত্মিক উৎকৃষ্টতা অর্জনে যেমন প্রজ্ঞার প্রয়োজন, তেমনি গৃহী জীবনে যশ ও খ্যাতি লাভের জন্যও প্রজ্ঞাসাধনার প্রয়োজন অপরিসীম। প্রজ্ঞাসাধনা ছাড়া মহৎ কাজ করা সম্ভব নয়। তাই বলা হয়, প্রজ্ঞাশক্তি যত প্রবল হবে, তত বেশি শুদ্ধ চেতনার বিকাশ হবে। অর্থাৎ সর্বকল্যাণ ও মঙ্গলকর্মের উৎসে প্রজ্ঞার প্রাধান্য রয়েছে। এছাড়া এটিও সত্য যে, প্রজ্ঞায় পূর্ণতা না এলে সাধনায়ও পূর্ণতা আসে না। এই প্রজ্ঞা পারমীর তিনটি রূপ হলো চিন্তাময়-প্রজ্ঞা, শ্রুতময়-প্রজ্ঞা ও ভাবনাময়-প্রজ্ঞা।

বীর্য পারমী

বীর্য শব্দের অর্থ হলো বীরত্ব, কর্মোদ্দীপনা ও কর্মচাঞ্চল্য। যথাসময়ে যথোপযুক্ত কাজের উদ্যোগ গ্রহণে সংকল্পবদ্ধ হওয়াকে বলে বীর্য পারমী। এটি দশ পারমীর পঞ্চম স্তর। বীর্য পারমী অনুশীলনের জন্য মনে বিশুদ্ধ কর্ম ও সর্বজনীন হিতকর্ম করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ ও মহৎ প্রচেষ্টা থাকতে হয়; যা সাধক অটল দৃঢ়চিত্তে অনুসরণ করেন। যাঁর এরকম চিত্ত জাগ্রত হয়, তাঁর দুঃখ মুক্তির পথও সুগম হয়। সাধনা যাঁর দুর্বল, তিনি কখনো লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন না। যাঁর সাধনা মধ্যম স্তরের, তিনি যেকোনো কাজ শুরু করলেও শেষ করতে পারেন না। কিন্তু যাঁর সাধনা উত্তম ও সুদৃঢ়, তিনি স্বাভাবিক গতিতেই লক্ষ্যে পৌঁছে যান। সাধনায় দৃঢ় ও কঠিন হলে প্রপঞ্চ ও মরীচিকা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব। এছাড়া বীর্য পারমীর সাধক একটি উন্নত চরিত্র ও আদর্শিক জীবনলাভে সমর্থ হয়। প্রত্যেক বুদ্ধ ও শ্রাবক বুদ্ধগণও এই বীর্য পারমীর পরিপূর্ণতার গুণে মহিমান্বিত হয়েছেন।

ক্ষান্তি পারমী

ক্ষান্তি মানে ক্ষমা। ক্ষান্তি পারমীর চর্চা হলো সহনশীলতার সাধনা করা। সহ্য, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অনুশীলনের মাধ্যমে এই সাধনা করতে হয়। পৃথিবী যেমন তার ওপর শুচি-অশুচি নানাবিধ বস্তু নিক্ষেপিত হলেও নীরবে সহ্য করে, নিক্ষেপকারীর প্রতি দয়া বা ক্রোধ কোনো কিছুই প্রদর্শন করে না, তেমনি সকল মান-অপমান সহ্য করাই ক্ষান্তি পারমী।

সত্য পারমী

সত্য বলা ও সততা অনুসরণে সংকল্পবদ্ধ হওয়াই সত্য পারমী। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে সদাচার নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা এবং সকল কাজে সত্যব্রত সাধনই হলো সত্য পারমী। কোনো অবস্থাতেই সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। সত্য পারমীতে কথা ও কাজের একাত্মতা থাকবে, কোনো দ্বৈতচিত্ত ভাবের প্রকাশ হবে না। এই সত্য সাধনার মূল্যায়ন নিজেকেই করতে হয়। সত্যের কোনো বিকল্প নেই। সত্যের পরিপন্থী কোনো বিষয়ের সঙ্গে কোনো আপস নেই। প্রয়োজনে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া যাবে; কিন্তু সত্যের অপলাপ কখনো হবে না— সত্য অনুসরণে এই ব্রতই সত্য পারমী।

অধিষ্ঠান পারমী

এটি দশ পারমীর অষ্টম ধাপ। সংকল্প ও প্রতিশ্রুতি পালনে অটল থাকার কঠিন সিদ্ধান্ত অনুসরণকেই অধিষ্ঠান পারমী বলে। চিত্তের এই একাগ্রতা ও অবিচল দৃষ্টিভঙ্গিই অধিষ্ঠান পারমীর প্রাণ। লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য

অধিষ্ঠান ব্রতের প্রয়োজন রয়েছে। স্বর্ণকে যেমন আগুনে পুড়িয়ে এর মলিনতা দূর করে ব্যবহার উপযোগী করা হয়, তেমনি অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য আরাম-আয়াস ত্যাগ করে অধিষ্ঠানকে প্রবলতর করতে হয়। লক্ষ্য অর্জনে সদিচ্ছার সৃষ্টি করতে হয়। এই সদিচ্ছা হবে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কর্ম সম্পাদনে জীবনপণ সদিচ্ছা। চঞ্চল চিত্তকে সাম্য দানের সদিচ্ছা। মানুষের সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় জীবনের সার্থকতা লাভের জন্য সর্বক্ষেত্রে চিত্তচাঞ্চল্য পরিহার করা আবশ্যক। অস্থির চিত্ত মানুষকে বিভ্রান্ত করে। সেজন্য বলা হয়, মানবজীবনের সার্বিক কল্যাণের প্রধান অবলম্বন হলো অধিষ্ঠান। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য যেকোনো ক্ষেত্রে সফলতার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট অধিষ্ঠান ব্রত আবশ্যক। কারণ, সংকল্পবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হলে জীবনে সাফল্য আসবেই। তাই বলা হয়ে থাকে— অধিষ্ঠান মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনের অন্যতম শক্তি।

মৈত্রী পারমী

নিজের মনে সর্বদা মৈত্রীভাব জাগ্রত রাখার সংকল্পবদ্ধ হওয়াই মৈত্রী পারমীর সাধনা। এই সাধনা আচরণে, চিন্তায় ও কথায় সর্বক্ষেত্রে অনুশীলন করতে হয়। সর্ব জীবের শুভকামনা ও সর্বসত্তার মঙ্গল চেতনাই মৈত্রী। মৈত্রী সাধনা অন্তরের হিংসা বিনাশ করে এবং নিঃস্বার্থ পরোপকারে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। সকল জীবের সঙ্গে একাত্মতা পোষণই মৈত্রীর স্বভাব। জল যেমন সৎ-অসৎ, হীন-উত্তম সকলকেই ধৌত করে, শীতল করে; তেমনি শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি সমান প্রীতিভাব পোষণ করে মৈত্রী সাধনায় পূর্ণতালাভ করতে হয়।

উপেক্ষা পারমী

সর্ববিধ বিষয়ে ও সকলের প্রতি মনের সমতাভাব বজায় রাখার দৃঢ় অনুশীলনই উপেক্ষা পারমী। এটি একপ্রকার লোভ-হিংসা বর্জিত মনোচেতনা। এই সাধনায় চিত্ত অনুরাগ-বিরাগশূন্য মধ্যম অবস্থাধীন হয়। এটি দশ পারমীর সর্বশেষ পারমী।

উপেক্ষার অনুশীলনে চিত্তে যে সাম্যভাব সৃষ্টি হয়, তাতে আত্ম-পর ভেদ মন থেকে ঘুচে যায়। সাধকের সর্বজনীন উদার মনোবৃত্তি জাগ্রত হয়। উপেক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয় জ্ঞান দ্বারা। তবে নিজের দায়িত্ব অবহেলা করে উপেক্ষার অনুসরণ গ্রহণযোগ্য হয় না। অর্থাৎ উপেক্ষার মাধ্যমে সকলের জন্য যেমন সেবা, মৈত্রী ও বন্ধুত্বভাব থাকবে, তেমনি সততা ও দায়িত্বের সঙ্গে নিজের কর্তব্য কর্মও পালন করতে হবে। উপেক্ষা অনুসরণকারী কারো প্রশংসায় উৎসাহিতও হয় না; আবার কারো বিরুদ্ধাচরণে কুপিতও হয় না। তাঁর চিত্ত থাকে সর্বদা সমভাবাপন্ন; মধ্যম স্বভাবের। যেমন নিজের প্রিয়জনকে দেখে উল্লসিতও নয়, আবার অপ্রিয়কে দেখে বিষাদময়ও নয়। চিত্তের এই স্থিত ভাব এক দিনে আসে না। এটি ধারাবাহিক চর্চার মাধ্যমে আয়ত্ত করতে হয়। এই চর্চা নিজের জন্য যেমন অত্যন্ত ফলপ্রসূ, তেমনি অন্যের জন্যও এটি পরম কল্যাণকর।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৬

ধর্মীয় বই, ইন্টারনেট বা অন্যান্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দলীয়ভাবে পারমী বিষয়ে তথ্যফুল তৈরি করি।

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

বানররূপী বোধিসত্ত্ব ও কৃষক

পারমী অনুশীলন রীতি

পারমীর অনুশীলন অত্যন্ত কঠিন। এ প্রক্রিয়া সর্বোচ্চ কঠোর ধারায় প্রবহমান থাকে। জন্ম-জন্মান্তরের অখন্ডিত ও অবিচ্ছিন্ন স্রোতধারায় চলে এর সাধন প্রক্রিয়া। যাকে দুঃখমুক্তির অভিযানও বলা যায়। এই ব্রতাচার বা পণবদ্ধতা এমন সুকঠিন যে, পারমী পালনকারীদের জীবন বিপন্ন হতে পারে; কিন্তু কোনো কারণেই আদর্শচ্যুতি ঘটে না। এমনই অনির্বচনীয় আদর্শের অধিকারী হয় পারমী আচার পালনের অভিলাষী ব্যক্তি। তিনি অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সুকঠিন দৃঢ়তা অবলম্বন করেন । তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও পালন করেন তাঁর আরাধ্য কর্ম। জীবন রক্ষার চেয়ে ব্রত রক্ষা করা বা অভীষ্ট অর্জনই পারমী চর্চাকারীর কাছে বড়। এ রকম চিত্তানুভূতি সাধনচিত্ত ছাড়া সাধারণের বোধগম্য নয়।

পারমী অনুশীলনকারীর কঠিন দৃঢ়তার জন্য প্রস্তুতিও প্রয়োজন। বৌদ্ধ দর্শনমতে বহু জন্মের সুকৃতির ফল না থাকলে এই প্রস্তুতি সম্পন্ন হয় না। জন্ম-জন্মান্তরের মন ও শরীরের সমন্বিত সাধনার ফলেই মানুষের জীবনে এই প্রস্তুতির ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। অত্যন্ত কঠিন-কঠোর এই পথ চলার প্রকৃতি। এটি হলো মুক্তি অন্বেষীর মার্গ বা পথ। এই মুক্তি লাভের পথ সুদীর্ঘ। অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণায় পূর্ণ এ পথ। তাই এই সীমাহীন এবং অজ্ঞাত ও অচিন্তিত কষ্টের ভার গ্রহণ করে মুক্তিমার্গ পাড়ি দেওয়ার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার ইতিহাস সত্যিই বিরল। এর জন্য পূর্ব জন্মসমূহের অপরিসীম কুশল কর্ম ও কর্মফলের প্রভাব রয়েছে। এই কুশল কর্মের ক্রমোন্নতি বা উৎকর্ষের ফলে কুশল চর্চাকারীর অন্তরে যখন প্রজ্ঞার উদ্ভব ঘটে, তখন ধারাবাহিক কর্মোন্নতির প্রয়াস ঘটে। এই ধারাবাহিক কর্মোন্নতির প্রয়াসই হলো পারমী; আর যে সত্তার অন্তরে এই পারমী পূরণের বা পালনের অদম্য ইচ্ছার সৃষ্টি হয়, তাঁকে বলা হয় 'বোধিসত্ত্ব'।

জাতকে পারমী অনুশীলনের দৃষ্টান্ত

জাতক সাহিত্যে বোধিসত্ত্বের পারমী সাধনার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত রয়েছে। পারমী অনুশীলনের প্রকৃতি জ্ঞাতার্থে একটি জাতক কাহিনি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এখানে 'মহাকপি' জাতকটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এ জাতকের কাহিনিটি অনুধাবন করলে দশ পারমীর প্রকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এতে দশ পারমীর পূর্ণ উপস্থিতি ও এগুলোর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।

বোধিসত্ত্ব পারমী চর্চার কালে বিভিন্ন প্রাণিকুলে জন্ম নিয়েছিলেন। সে সময় প্রাচীন ভারতের কাসী গ্রামে তিনি একবার বানর প্রজাতিতে জন্মগ্রহণ করেন। সেই গ্রামের অদূরেই ছিল এক বন। বানররূপী বোধিসত্ত্ব সেই বনেই বাস করতেন। কাসী গ্রাম থেকে বনে যাতায়াতের সুব্যবস্থা ছিল। সে গ্রামের এক কৃষক একদিন তার কয়েকটি গরুকে জমিতে ছেড়ে দিয়ে নিজে চাষের কাজ করছিলেন। গরুগুলোও ঘাস খাওয়ার জন্য বিস্তীর্ণ জমিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কাজ শেষে যখন বিকেলে বাড়ি ফেরার সময় হলো, তখন কৃষক তার একটি গরু খুঁজে পেলেন না। ভীষণ চিন্তিত হলেন তিনি। গরুর সন্ধানে তিনি এদিক-সেদিক ছুটতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে কৃষক গ্রাম সংলগ্ন হিমালয়ের নিকটবর্তী গভীর বনে নিজের অজ্ঞাতেই ঢুকে পড়লেন। এ সময় মনের ভুলে কৃষক পথও হারিয়ে ফেললেন। দিক ভুলে যাওয়ায় বনে ঘুরতে ঘুরতে কৃষকের সপ্তাহকাল কেটে গেল। অনাহারে ও মানসিক চিন্তায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন কৃষক। একদিন বনে ঘুরতে ঘুরতে কৃষক একটি ফলবৃক্ষ দেখে তাতে উঠে ফল খেতে লাগলেন। হঠাৎ পা পিছলে তিনি গাছ থেকে পড়ে যান। পড়লেন মাটিতে নয়, গভীর এক অন্ধকূপসদৃশ গহবরে, যা গাছের পাশেই ছিল। জীবনের মায়া ত্যাগ করে উপায়হীনভাবে সেই গহ্বরে কৃষক দশ দিন পার করলেন। তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ প্রায় অচেতন হয়ে এলো। এমন সময়ে বোধিসত্ত্ব ঐ গাছের ফল খেতে গিয়ে তিনি গর্তে পতিত কৃষককে দেখতে পেলেন। একজন মানুষের দুরবস্থা বানররূপী বোধিসত্ত্বের মনে অসীম দয়ার উদ্রেক হলো।

বানর মৃত্যুপথযাত্রী সেই কৃষককে বাঁচাতে উদ্যত হলো। বানর এ কাজে নিয়োজিত হওয়ার আগে নিজের শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন হলো। এরপর বানর তার ইচ্ছার বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করল। নিচে বানরের ইচ্ছা বাস্তবায়নের কার্যক্রগুলো অনুক্রমিকভাবে উল্লেখ করা হলো। এতে দশ পারমীর বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ দেখা যায়। যেমন:

১. একজন মানুষকে অসহায় অবস্থায় দেখে বানরের চিত্ত কৃষকের কল্যাণে অনুপ্রাণিত হলো। প্রেম ও করুণায় পূর্ণ হলো তার হৃদয়। মনে হলো, যেন তার নিজের সন্তান কূপে পড়ে আছে। বানরের এ রকম অনুভূতি জাগল।

২. তখন বানর নিজের জীবন বিপন্ন করে হলেও সেই কৃষককে উদ্ধার করার সংকল্পবদ্ধ হলো।

৩. এরপর কৃষককে উদ্ধারের জন্য বানর নানা উপায়ে চিন্তা করতে লাগল। দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনার পর বানর এই সিদ্ধান্তে এলো যে, কৃষককে পিঠে নিয়ে কূপ থেকে এক লাফে উপরে উঠে আসতে পারলেই তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হবে।

৪. তবে এতে বিপদের আশঙ্কাও কম নয়। কূপ থেকে লাফ দিয়ে যদি প্রয়োজন অনুসারে উপরে উঠতে ব্যর্থ হয়, এতে এই দুর্বলকায় কৃষকের মৃত্যু অবধারিত। তাই এ অভিযানের জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন। প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বানর কৃষকের ওজনের আনুমানিক পরিমাপের এক খণ্ড পাথর তার নিজের পিঠে বেঁধে কয়েকবার গর্ত থেকে লাফ দিয়ে ওঠার পরীক্ষা সেরে নিল। এভাবে পরীক্ষামূলক প্রস্তুতিতে বানরের সামর্থ্য প্রমাণিত হওয়ার পর বানর নিজের পিঠে কৃষককে বেঁধে কূপ প্রান্তে লাফ দিয়ে উঠে এলো। বানরের এ অভিযান সার্থক হলো। কৃষক নির্ঘাত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেল।

৫. বানর জানত যে, কৃষককে এভাবে বাঁচানোর চেষ্টায় তার নিজেরও মৃত্যু ঘটতে পারে, এতে বানর পিছপা হয়নি। অন্যের জীবন রক্ষার জন্য নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত হয়েই বানর এ অভিযান পরিচালনা করেছিল।

৬. কৃষককে নিয়ে বানর কূপ থেকে ওঠার পর ভীষণ পরিশ্রান্ত হলো। কৃষকও ছিল প্রায় অচেতন। এ সময় অচেতন কৃষকের কোলে মাথা রেখে বানর একটু বিশ্রাম নিতে লাগল। কিছুক্ষণ পর কৃষকের সম্বিৎ ফিরে এলো। বানরকে কাছে পেয়ে তার অন্তরে লোভ ও মোহচৈতন্য জাগ্রত হলো। তখন তার চিত্তে অকৃতজ্ঞতাবোধ তীব্র হলো। বিশ্রামে ঘুমন্ত বানরটিকে হত্যা করে মাংস নিয়ে ঘরে যাবার বাসনা হলো কৃষকের। সেরকম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এক খণ্ড পাথর নিয়ে পরিশ্রান্ত অচেতন বানরের মাথায় আঘাত হানল কৃষক। এতে বানরের মৃত্যু ঘটল না বটে, কিন্তু মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বানর দ্রুত একটি গাছে উঠে পড়ল। বানর অত্যন্ত মনোকষ্ট পেল। কিন্তু কৃষকের প্রতি তার কোনো প্রকার প্রতিহিংসা বা ক্রোধ জন্ম নিল না।

৭. কারণ, কৃষককে বাঁচানোর জন্য সে নিজের বিবেকের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। এমনকি বানর তার কায়বাক্যে ও কর্মে কৃষককের প্রতি কোনো প্রকার শত্রুতা বা অসন্তুষ্টি দেখাল না।

৮. কৃষক যে বানরের জীবননাশের চেষ্টা করেছিল, তা বানর সম্পূর্ণ মন থেকে মুছে ফেলল, এবং কৃষকের প্রতি আগের মতো মানসিক সমতা অব্যাহত রাখল।

৯. তারপর বানর অনুধাবন করল যে, কৃষক একাকী এ গহিন বনভূমি থেকে বের হওয়ার পথ না-ও চিনতে পারে। তাই বানর গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে চলে, তার মাথার ক্ষতস্থান থেকে যে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিল, সে রক্ত চিহ্ন দিয়ে কৃষককে পথনির্দেশ করতে লাগল। কৃষকও ভাবতে লাগলো রক্তাক্ত বানরের কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্যু হতে পারে, এতে তার উদ্দেশ্য সফল হবে। তাই সে রক্তচিহ্ন ধরে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে কৃষক একসময় বন থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হলো। বানর কৃষককে বাঁচানোর সংকল্পটি এভাবেই শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে সক্ষম হলো।

১০. কৃষককের বাঁচানোর অভিপ্রায়ের মধ্যে বানরের কোনো প্রকার স্বার্থচিন্তা ছিল না। জাগতিক লাভ ও প্রশংসার মোহ, কোনো কিছুর প্রত্যাশা না করেই বানর এ কাজ সম্পাদন করেছিল।

এ জাতকের বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতাকে উল্লিখিত অনুক্রমিক ঘটনাগুলো পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করলে দশ পারমীর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন:

১. নিজের জীবন দিয়েও কৃষককে বাঁচানোর চেষ্টা বানরের যে নির্মোহ আত্মনিয়োগ, তা-ই 'দান পারমী'।

২. কৃষক পাথর দিয়ে মাথায় আঘাতের পরও বানব যে কৃষকের প্রতি কায়বাক্য ও কর্মে কোনো প্রকার বিদ্বেষ ও অসূয়ার ভাব দেখায়নি — এটিই 'শীল পারমী'।

৩. কৃষকের জীবন রক্ষায় বানর কোনো প্রতিদান প্রত্যাশা করেনি — এটি 'নৈষ্ক্রম্য পারমী'।

৪. বানর কৃষককে কূপ থেকে উদ্ধারের জন্য উপায় উদ্ভাবনের যে চেষ্টা করেছিল, তা হলো 'প্রজ্ঞা পারমী'।

৫. কৃষকের নিরাপদ উদ্ধারপ্রক্রিয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বানর কূপ প্রান্তে বারবার লাফ দিয়ে উঠে আসার পরীক্ষা চালিয়ে শেষে যে সাহসের সঙ্গে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, তা 'বীর্য পারমী'।

৬. বানর মাথায় আঘাত পেয়ে দারুণ কষ্ট ভোগ করলেও কৃষকের প্রতি তার কোনো ক্রোধ, প্রতিহিংসা বা শত্রুতা ভাব জন্মেনি। এই অহিংস মনোভাব চেতনাই হলো 'ক্ষান্তি পারমী'।

৭. বানররূপী বোধিসত্ত্ব নিজের জীবন বিপন্ন করেও সেই কৃষকের জীবন রক্ষায় উচ্চারিত পূর্ব সংকল্প শেষ পর্যন্ত যে রক্ষা করেছিল সেই একনিষ্ঠ প্রতিজ্ঞাবদ্ধতাই হলো 'সত্য পারমী'।

৮. কৃষক বানরকে হত্যার চেষ্টা করলেও বানর চিত্ত চঞ্চলতায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। সে সংযমের সঙ্গে একই ব্রতে শেষ পর্যন্ত অবিচলিত ছিল। এটিই হলো 'অধিষ্ঠান পারমী'।

৯. কূপে পতিত কৃষকের দুর্দশা দেখে বানরের হৃদয় যে করুণা ও প্রেমে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল, তা-ই হলো 'মৈত্রী পারমী'।

১০. বানর তার হত্যাপ্রচেষ্টার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে যে মানসিক ধৈর্য ও স্থিতি অব্যাহত রেখেছিল, তা-ই হলো 'উপেক্ষা পারমী'।

উপরিউক্ত বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পারমীর বিভিন্ন ধরনের অনুশীলন রীতি থাকলেও এগুলো একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক গভীর। যেমন মালায় গাঁথা ফুলের মতো। অসংযম ও চিত্ত বিভ্রান্তির কারণে যেকোনো একটি পারমী অনুশীলনে ব্যত্যয় ঘটলে অন্যগুলোর অনুশীলন বা পালন করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

পারমী অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা

পারমী শুধু একটি আচরণপ্রক্রিয়া নয়, এটি মানুষের মানসিকতা বিশুদ্ধকরণের এক মহা উপায়ও বটে। তাই জ্ঞানের পূর্ণতা অর্জনে ও ক্লেশের বিনাশ সাধনে পারমী চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনেক। নিজের চিত্তের উদারতা সৃষ্টিতে এবং সর্বজনীন আদর্শিক জীবন গঠনের পারমী একটি অনন্য পন্থা। বিশেষ করে অভেদ কল্যাণমুখী চেতনার জাগরণের জন্য পারমীর অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বৌদ্ধধর্মের পরিভাষায় এটি পারমী নামে আখ্যায়িত হলেও এর আচরণগত উৎকর্ষের ফল সর্বজনীন। তাই ধর্মীয় দৃষ্টিতে নয়, মানবিক গুণাবলি আয়ত্ত করার জন্য প্রত্যেকের জীবনে এরকম বিধিবদ্ধ আচরণ থাকা আবশ্যক। কারণ, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, পেশানির্বিশেষে নিজ-নিজ মনের বিশুদ্ধতার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। সর্বজনীনভাবে এই ধারা অনুসরণ করলে আমাদের পরিবার ও সমাজ উপকৃত হবে। ব্যক্তিজীবন হবে সুন্দর ও শান্তিময়। তাই বলা যায় যে, উন্নত মানবিক ও গুণসম্পন্ন চরিত্র গঠনে পারমী চর্চার কোনো বিকল্প নেই। আমাদের জীবনে পারমী একটি অনন্য পালনীয় জীবনবিধি।

পারমীর দ্বিবিধ স্বরূপ

বৌদ্ধধর্ম কালের প্রবাহে দুটি ধারায় বিস্তৃত হয়েছে। এর একটি থেরবাদ বা হীনযান; অন্যটি মহাযান নামে পরিচিত। থেরবাদ বলতে আদি বৌদ্ধধর্মের নিয়ম-নীতি অনুসরণকারীদের বোঝানো হয়। অর্থাৎ তথাগত বুদ্ধের সময় বিধিবদ্ধ রীতি ও সংস্কার পালনকারীদের বলা হয় থেরবাদী বা হীনযানী। অন্যদিকে যুগের প্রয়োজনে বৌদ্ধ আদি সংস্কৃতির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে যারা অনুসরণ করেন, তাদের বলা হয় মহাযান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। উভয় চর্চায় বৌদ্ধ দর্শন ও মৌলিক তত্ত্বে কোনো পার্থক্য নেই। যেমন: থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের পারমী বিধি মহাযান বৌদ্ধধর্মেও রয়েছে। তবে থেরবাদে এই পারমীর ধাপ দশটি হলেও মহাযানে এ ধাপ ছয়টি। এগুলো হলো যথাক্রমে—

১. দান পারমী

২. শীল পারমী

৩. ক্ষান্তি পারমী

৪. প্রজ্ঞা পারমী

৫. বীর্য পারমী

৬. ধ্যান পারমী

উল্লিখিত ছয় পারমীর মধ্যে থেরবাদের দশ পারমী বিদ্যমান। অর্থাৎ থেরবাদে অনুশীলনে যে বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, মহাযানের ছয় পারমীর অনুশীলনে সেগুলোর উপস্থিতি রয়েছে। তাই দৃশ্যত মহাযানে পারমী চর্চা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে মনে হলেও বাস্তবতায় উভয় বৌদ্ধধর্ম দর্শনে পারমীর সকল অনুসরণীয় বিধি বিদ্যমান এবং উভয়ই প্রায় সমরূপ।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৬

পারমীর কোন কোন বিষয় নিজ জীবনে কীভাবে প্রয়োগ বা চর্চা করবে তার একটি পরিকল্পনা তৈরি করো।

পারমীর কোন কোন বিষয় নিজ জীবনে প্রয়োগ বা চর্চা করবে?	কীভাবে প্রয়োগ বা চর্চা করবে

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৭

পারমীর কোন কোন বিষয় কীভাবে অন্যদেরও চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করবে, তার একটি পরিকল্পনা তৈরি করো।

পারমীর কোন কোন বিষয় অন্যদেরও চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করবে	কীভাবে উদ্বুদ্ধ করবে

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৮

পরিকল্পনা তৈরির অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে তোমার লিখিত মতামত দাও
কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)?
কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)?
সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?
ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)?

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

ফিরে দেখা: নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে এবং না হলে না এর ঘরে (✓) চিহ্ন দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না

অভিধর্ম পিটক

এই অধ্যায়ের পাঠ শেষে আমরা ধারণা করতে পারব—

- অভিধর্ম পিটকের পরিচয়;
- অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়;
- বিষয়বস্তুর গুরুত্ব;
- পাঠের প্রয়োজনীয়তা।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ১৯

তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী শ্রেণির সেশনগুলোতে অভিধর্ম পিটকের নাম শুনেছ।

আজকের সেশনে অভিধর্ম পিটকের একটি গ্রন্থ সরাসরি/অনলাইনে/চিত্রের মাধ্যমে দেখব।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২০

আমরা যে অভিধর্ম পিটক দেখলাম এবং পড়লাম, সেই অভিজ্ঞতাটি নিচে লিখে ফেলি।

অভিজ্ঞতা

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অভিধর্ম পিটকের পরিচয়

অভিধর্ম পিটক হলো ত্রিপিটকের তৃতীয় অংশ বা শেষ অংশ। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস অনুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় সংগীতিতে বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মবাণীকে 'ধম্মঞ্চ বিনযঞ্চ' ধর্ম ও বিনয় নামে আখ্যায়িত করা হয়। তৃতীয় সংগীতিতে ধর্মকে ভাগ করে সূত্র ও অভিধর্ম নামে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ধর্ম শব্দের সঙ্গে 'অভি উপসর্গ যোগ করে অভিধর্ম পদ গঠিত হয়। 'অভি', 'অতি', 'অধি'প্রভৃতি সমার্থক উপসর্গ। এর অর্থ 'অধিক', 'বেশি', 'অতিরিক্ত বিশিষ্ট'অথবা 'অধিকতর'। সুতরাং অভিধর্ম শব্দের অর্থ বিশিষ্ট ধর্ম, অতিরিক্ত ধর্ম, অধিকতর ধর্ম। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে সুত্রাতিরিক্ত ধর্মই অভিধর্ম। ধর্ম ও অভিধর্মের আলোচ্য বিষয় প্রায় এক। উভয়ের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। সূত্রপিটকে যা সাধারণভাবে উপদেশিত হয়েছে অভিধর্মপিটকে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সূত্রপিটকে যে ধর্ম লৌকিকভাবে দেশনা করা হয়েছে,তা অভিধর্ম পিটকে অসাধারণভাবে, লোকোত্তরভাবে বা পারমার্থিক উপায়ে আলোচিত হয়েছে।

অভিধর্ম পিটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় চারটি। 'চিত্ত চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ। সূত্রপিটকের ভাষা ব্যবহারিক যেমন: সত্ত্ব, আত্মা, জীব, জন্ম, মৃত্যু, দেব, ব্রহ্মা, তুমি আমি মানুষ ইত্যাদি। অপরদিকে অভিধর্মের বিষয়বস্তু পরমার্থ সম্পর্কীয় যথা: স্কন্ধ, আয়তন, ইন্দ্রিয়, ধাতু, চ্যুতি, প্রতিসন্ধি, সন্ততি, আত্মা, বল, বোধ্যঙ্গ, নির্বাণ প্রজ্ঞপ্তি ইত্যাদি। অভিধর্ম বৌদ্ধ মননশীলতার চরম বিকাশ। বৈজ্ঞানিকভাবে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও প্রমাণের মাধ্যমে অভিধর্মে প্রকৃত সত্য উপস্থাপন করা হয়। তাই অভিধর্মের মূল আলোচ্য বৌদ্ধ দর্শন ও পরামার্থ সত্য। মূলত অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থগুলোর বুদ্ধের ধর্মের উচ্চতর বিষয়গুলো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ সহকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থসমূহ

অভিধর্ম পিটক সাত ভাগে বিভক্ত। যথা: ১. ধম্মসঙ্গানী, ২. বিভঙ্গ, ৩. ধাতু কথা, ৪. পুগ্গলপ পঞ্ঞত্তি, ৫. কথাবত্থু, ৬. যমক ও ৭. পট্ঠান।

১. ধম্মসঙ্গানি: ধম্মসঙ্গানী অভিধর্ম পিটকের প্রথম গ্রন্থ। ধম্মসঙ্গানি শব্দের মূল অর্থ 'ধর্ম বা গণনা' বা ধর্মের সংক্ষিপ্ত দেশনা। বস্তুতপক্ষে ধম্মসঙ্গানি অভিধর্মের বিশুদ্ধ সারাংশ। ধম্মসঙ্গানি সমগ্র অন্তর্জগত ও বহির্জগতের যাবতীয় বিষয়কে অর্থাৎ চিত্ত, চৈতসিক ও রূপকে নীতি বা কর্ম ও কর্মফলানুসারে কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃতকে শ্রেণিবিভাগ করে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে কামলোক, রূপলোক, অরূপলোক ও নির্বাণ সম্পর্কীয় বিষয়গুলো সুন্দরভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সংগৃহীত করা হয়েছে। নামরূপকে কার্যকারণ নীতি অনুসারে কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ধম্মসঙ্গানির আলোচ্য বিষয়কে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা: ১. চিত্ত চৈতসিকের বিশ্লেষণ, ২. রূপ বা জড় পদার্থের বিশ্লেষণ ও ৩. বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সার বা নিক্ষেপ। উক্ত তিনটি বিভাগকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যথা: ১. কুশল ধর্ম, ২. অকুশল ধর্ম, ৩. অব্যাহকৃত ধর্ম এবং ৪. নিক্ষেপ্ত বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তন্মধ্যে কুশল বিষয়গুলো কুশল ধর্ম, অকুশল চিত্তসমূহ, অকুশল ধর্ম, বিপাক চিত্ত ক্রিয়াচিত্ত এবং রূপ হলো অব্যাকৃত ধর্ম। ধর্মসঙ্গানী গ্রন্থটিকে সর্বমোট চৌদ্দ অধ্যায় বা পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে।

২. বিভঙ্গ: অভিধর্ম পিটকের দ্বিতীয় গ্রন্থ হলো বিভঙ্গ। সর্বাস্তিবাদীদের মতে এটির অপর নাম 'ধর্মস্কন্ধ'। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এটি ধর্ম্মসঙ্গানির সমগোত্রীয় হলেও রচনাপদ্ধতি ভিন্ন, ধম্মসঙ্গানির রচনাপ্রণালি বিশ্লেষণমূলক। বিভঙ্গের রচনাপ্রণালি সংশ্লেষণমূলক। বিষয়বস্তুর বিচারে বিভঙ্গকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. সুত্ত ভাজনীয়, ২. অভিধর্ম ভাজনীয় এবং ৩. পঞ্ঞাপুচ্ছক। বিভঙ্গ গ্রন্থের আঠারটি অধ্যায় আছে। অধ্যায়গুলোর আলোচ্য বিষয় হলো : পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তন, আঠার প্রকার ধাতু (অষ্টাদশ ধাতু), চার আর্য সত্য, দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয়, প্রতীত্যসমুৎপাদ, চার স্মৃতি প্রস্থান, চার সম্যক প্রধান, চার ঋদ্ধিপাদ, সপ্তবোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টঙ্গিক মার্গ, ধ্যান, পঞ্চশীল, চার অপ্রমেয় শিক্ষাপদ, চারি প্রতিসম্ভিদা, জ্ঞান বিভঙ্গ, ক্ষুদ্রবস্তু বিভঙ্গ, (চিত্তের অকুশল অবস্থার দীর্ঘ তালিকা) প্রভৃতি সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

৩. ধাতুকথা: অভিধর্ম পিটকের তৃতীয় গ্রন্থ। ধাতুকথা শব্দের অর্ধ ধাতু-সম্পর্কীয় কথা বা আলোচনা। চিত্ত ও চৈতসিকের আলোচনা এ গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত রয়েছে। এতে যোগী বা ধ্যানপরায়ণ ভিক্ষুর মানসিক বৃত্তি বা চিত্ত চৈতসিকের আলোচনা অত্যধিক লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো : পঞ্চ স্কন্ধ (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান)। দ্বাদশ আয়তন (চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, মন ও ধর্ম)। আঠার প্রকার ধাতু (চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রোত্র বিজ্ঞান, ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান, মন, মনোবিজ্ঞান, ধর্ম)। চার প্রকার ধ্যান (প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান এবং চতুর্থ ধ্যান), পঞ্চবল (শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা)। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ (সম্যক) দৃষ্টি সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম বা প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ইত্যাদি।

বুদ্ধের সঙ্গে সারিপুত্র ও মৌগ্‌গল্যায়ন

৪. পুগ্গল পঞ্ঞত্তি: পুগ্গল পঞ্ঞত্তি বা পুদগল প্রজ্ঞপ্তি। অভিধর্ম পিটকের চতুর্থ গ্রন্থ। এ গ্রন্থের রচনা, সত্য বিশ্লেষণ, বর্ণনা প্রক্রিয়া, বিষয়বস্তুর বিন্যাস প্রভৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অভিধর্ম পিটকের চেয়ে সুত্রপিটকের সঙ্গে অধিক মিল দেখা যায়। অভিধর্ম পিটকের অন্যান্য গ্রন্থে চিত্ত, চৈতসিক, নাম, রূপ ও নির্বাণ প্রভৃতি পরামার্থ সত্য সম্পর্কীয় বিষয়সমূহ যেভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেভাবে এতে ধর্মসমূহের নির্দেশ করা হয়নি। পুদ্গল প্রজ্ঞপ্তি বা পালি পুগ্গল পঞ্ঞত্তি এ শিরোনামটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। পুদগ্গা পুগ্গল শব্দের ব্যবহারিক সত্যানুসারে ব্যক্তি, পুরুষ সত্ত্বা বা আত্মা, পরমার্থ সত্য অনুসারে পুদগলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। এটি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল চিত্ত সন্ততি মাত্র। 'প্রজ্ঞপ্তি বা পঞ্ঞত্তি শব্দের অর্থ 'প্রজ্ঞাপনা, জ্ঞাত করা, দর্শন করা, প্রকাশ করা।' অর্থাৎ যথার্থ বলে নির্দেশ করা। সুতরাং পুদ্গল প্রজ্ঞপ্তি শব্দের অর্থ হলো, যে পুস্তক ব্যক্তিবিশেষ বা পুদগলের পরিচয় প্রদান করে। এ গ্রন্থে স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, সত্য, ইন্দ্রিয় এবং পুদগল এই ছয় প্রকার প্রজ্ঞপ্তির উল্লেখ দেখা যায়। দ্বিবিধ প্রকার পুদগলের যথাযথ পরিচয় প্রদানই এ গ্রন্থের মূল লক্ষ্য। গ্রন্থটি দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রন্থের প্রারম্ভে তৎপর একবিধ পুদ্গল, বিবিধ ত্রিবিধ, চতুর্বিধ পঞ্চবিধ, ষড়বিধ, সপ্তবিধ, অষ্টবিধ, নববিধ এবং দশবিদ পুদগলের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সমগ্র গ্রন্থটিতে প্রধানত পঞ্চাশ প্রকার পুদগলের বিশদ বর্ণনা রয়েছে। যার মধ্যে সম্যক সম্বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ, আর্যপুদগল ও তাদের শ্রেণিবিন্যাস, শ্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী, শৈক্ষ, অশৈক্ষ এবং পৃথকজন লোভ চরিত, দ্বেষচরিত, মোহচরিতসহ বহু প্রকার পুদগলের বর্ণনা দেখা যায়।

৫. কথাবত্থু: অভিধর্ম পিটকের পঞ্চম গ্রন্থ হলো কথাবত্থু। এটিকে বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কীয় তর্কশাস্ত্র বলা হয়। মূল ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলোর মধ্যে একমাত্র কথাবত্থু গ্রন্থের সংকলকের নাম পাওয়া যায়। সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় পাটলিপুত্রের অশোকারামে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতিতে অধর্মবাদী ভিক্ষুদের বুদ্ধ শাসন থেকে বিতাড়িত করা হয়। সে সময় ভিক্ষু সংঘের নায়ক অর্হৎ মোগ্গলিপুত্র তিষ্য স্থবির বিভাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠায়

এ গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটিতে তেইশটি অধ্যায় আছে। প্রতিটি অধ্যায়ে আট থেকে বারোটি করে প্রশ্নোত্তরমালা রয়েছে। মোগ্গলিপুত্র তিষ্য স্থবির এ গ্রন্থে প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, থেরবাদ বা স্থবিরবাদই বুদ্ধের মূল নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটাকে বিভাজ্যবাদও বলা হয়। মিথ্যাদৃষ্টি যুক্তি বা মত খণ্ডন করার জন্যই এ গ্রন্থের রচনা। এ গ্রন্থে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উত্থাপিত জটিল দার্শনিক তত্ত্বের প্রশ্নোত্তসমহূ সমাধান করা হয়েছে। সম্পন্ন ভিক্ষুদের এভাবে অভিধর্মের কঠিন দুর্বোধ্য দার্শনিক বিষয়গুলোকে এ গ্রন্থে যুক্তি উপমার মাধ্যমে সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থটি ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত করার কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে পন্ডিতগণ বলেন, এতে এমন কোনো বিষয় যুক্ত করা হয়নি যা ত্রিপিটকের কোথাও না কোথাও দৃষ্টি হয় না। মূল ত্রিপিটকে যা আছে, এতে তা-ই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে মাত্র। এ গ্রন্থটির ভাব, ভাষা ও রচনার বৈশিষ্ট্য ত্রিপিটক সাহিত্যের অন্যতম গ্রন্থ মিলিন্দ প্রশ্নের সঙ্গে বিশেষভাবে তুলনা করা যায়। বৌদ্ধধর্ম দর্শনের মৌলিক নির্যাস এ গ্রন্থে প্রতিফলিত হওয়ায় এটি ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৬. যমক: এটি পিটকের ষষ্ঠ গ্রন্থ। গ্রন্থখানি বিবিধ প্রকার যমকে বিভক্ত। যেমন : মূল যমক, খন্ধ যমক, আয়তন যমক, ধাতু যমক, সচ্চ যমক, সঙ্গার যমক, অনুশয় যমক, চিত্ত যমক, ধর্ম যমক এবং ইন্দ্রিয় যমক। যমক শব্দের অর্থ হলো যুগল বা জোড়া। যমক বলতে একই বিষয়ে জোড়া প্রশ্নের অবতারণাকে বুঝায়। এ প্রশ্ন দুটিতে কারণ থেকে কারণের সত্য উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থটি দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল যমকে কুশল এবং অকুশলও তাদের মূল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। খন্ধ বা স্কন্ধ যমকে পঞ্চস্কন্ধের বর্ণনা রয়েছে। ধাতু যমকে অষ্টাদশ প্রকার ধাতুর বিস্তৃত অর্থ বর্ণিত হয়েছে। সত্য যমকে চতুরার্য সত্যের বর্ণনা রয়েছে। সংস্কার যমকে তিন প্রকার সংস্কারের ব্যাখ্যা (কায়সংস্কার, বাক্যসংস্কার এবং মনসংস্কার) রয়েছে। অনুশয় যমকে রয়েছে সাত প্রকার অনুশয়ের দার্শনিক বিচার (কাম, রাগ, পটিঘ, দৃষ্টি, চিকিৎসা, মান, ভবরাগ ও অবিদ্যা) যেগুলোকে অনাগত চিত্তক্লেশ বলা হয়। চিত্ত যমকে চিত্ত ও চৈতসিক সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। ধর্ম যমকে কুশল ও অকুশল ধর্মের তাৎপর্য বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইন্দ্রিয় যমকে রয়েছে বারো প্রকার ইন্দ্রিয়ের পরিচেয়।

৭. পট্ঠান: অভিধর্ম পিটকের সপ্তম গ্রন্থ বা শেষ গ্রন্থ। নামরূপ সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যাপারে পরস্পর সম্পর্ক ও কারণ নির্ণয় করাই এটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। পট্ঠান শব্দের অর্থ হলো মূল কারণ, প্রকৃত কারণ বা প্রধান কারণ। এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় ২৪ প্রকার প্রত্যয়। প্রত্যয় শব্দের অর্থ : কারণ, নিদান হেতু। যার সহায়তায় কোনো কাজ সম্পন্ন হয়। নামরূপের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গ্রন্থটিতে সূত্রপিটকের দ্বাদশ নিদানে উল্লেখিত প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতিকে ২৪ প্রকার প্রত্যয়রূপে বিভাগ করে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অভিধর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নামরূপের অনিত্যতা ও অনাত্মতা। অভিধর্মের পট্ঠান প্রকরণে এর যথার্থ ও চূড়ান্ত বিশ্লেষণ যথার্থভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। পট্ঠানে আলোচিত ২৪ প্রকার প্রত্যয় হলো : হেতু, আরম্মন, অধিপতি, অনন্তর, সমনন্তর, সহজাত, অঞ্ঞমঞ্ঞ নিস্সয, উপনিস্সয, পুরোজাত পচ্ছাজাত, আসেবন, কম্ম, বিপাক, আহার, ইন্দ্রিয়, ঝান (ধ্যান), মগ্গ, সম্পযুক্ত বিপপযুক্ত, অত্থি, নত্থি, বিগত এবং অবিগত প্রত্যয়। পুনরায় ২৪ প্রকার প্রত্যয়কে আলোচনার সুবিধার জন্য চারটি প্রত্যয়ের সমষ্টিভুক্ত করা হয়। যথা : ১. আলম্বন, ২. উপনিশ্রয়, ৩. কর্ম এবং ৪. অস্তি প্রত্যয়। গ্রন্থটিতে চারটি বিভাগ রয়েছে। যথা : অনুলোম পট্ঠান, পচ্চনীয় পট্ঠান, অনুলোম পচ্চনীয় পট্ঠান এবং পচ্চনীয় অনুলোম পট্ঠান। সূত্র, বিনয় কিংবা অভিধর্ম পিটকের অন্য কোনো গ্রন্থে প্রত্যয়সমূহের এরূপ বিবিধ প্রকারে বিশ্লেষণ করা হয়নি। অভিধর্ম বিষয়ে সবার জ্ঞানার্জনের জন্য এ গ্রন্থের অধ্যয়ন একান্ত অপরিহার্য।

অভিধর্মের গুরুত্ব

বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম দর্শনের মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান লাভের জন্য অভিধর্ম পিটকের পঠন-পাঠন একান্ত অপরিহার্য। সূত্র পিটকে যে সমস্ত বিষয় অতি সহজ সরল ও উপমাসহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। অভিধর্ম পিটকে তা মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে- অভিধর্ম পিটকের মূল আলোচ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয় হলো চিত্ত, চৈতসিক রূপ ও নির্বাণ। অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থগুলিতে এ চারটি বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সূত্র পিটকে চিত্তকে, মন, হৃদয় অন্তকরণ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্ত অভিধর্ম পিটকে তা মৌলিক হিসেবে চিত্তকে গ্রহণ করা হয়েছে। চিত্ত কী, চিত্তের প্রকারভেদ, ভূমিভেদে চিত্তের অবস্থা, চিত্ত কীভাবে চৈতসিকের রূপ ধারণ করেছে, চৈতসিকের শ্রেণিবিন্যাস ইত্যাদি বিষয়গুলো পারমার্থিক বা লোকোত্তরভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সূত্র পিটকে যা সাধারণভাবে উপদেশিত হয়েছে অভিধর্ম পিটকে তা পারমার্থিক উপায়ে আলোচিত, বিভাজিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। বৌদ্ধ দার্শনিকের ভাষায় "সূত্রের ভাষা আছে, সে ভাষার তরঙ্গ আছে, উচ্ছ্বাস আছে, উদান আছে, গাথা আছে, উদ্দীপনা আছে, অপায় আছে, অপায় ভয় আছে, দেব ব্রহ্মা আছে, দেব ব্রহ্মলোকের আকর্ষণ আছে, নির্বাণের সুসমাচার আছে। অভিধর্ম যেন ভাষাহীন–শুধু ছেদন, বিশ্লেষণ, বিভাজন, পর্যবেক্ষণ এবং নৈর্ব্যক্তিক পরম সত্যজ্ঞানের উদ্ভাবন। সঙ্গে সঙ্গে চির চঞ্চল ব্যবহারিক জগতের নিরবশেষ বিলয় সাধন। ভগবান তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম মাত্রই মনোবিজ্ঞানসম্মত এবং নীতি প্রধান। ত্রিপটকের সর্বত্র ধর্মকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশ্লেষণ করবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অভিধর্মের প্রতিপাদ্য বিষয় অনুসারে যথোপযুক্ত পরিভাষা ও প্রজ্ঞপ্তি দ্বারা পরিজ্ঞেয় বিষয়ের পরিচয় প্রদান ও শ্রেণি বিভাগ করা হয়েছে। অভিধর্ম পিটকে যে নাম রূপের স্বরূপ উদঘাটন করা হয়েছে তা সূত্র পিটকে সর্ব সাধারণের উপযোগী করে পুনরায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ কারণে সূত্র পিটকের ভাষা ব্যবহারিক বা "বোহারবচন"। যেমন: সত্তা, আত্মা, জীব, জন্ম, মৃত্যু, দেব, ব্রহ্মা, তুমি, আমি, মনুষ্য ইত্যাদি। অপরদিকে অভিধর্মের বিষয়বস্তু পরমার্থ সম্পর্কীয় পরমার্থ বচন। যথা : স্কন্ধ, চ্যুতি, প্রতিসন্ধি, সন্ততি, আত্মা, বল, বোধ্যঙ্গ, নির্বাণ ও প্রজ্ঞপ্তি ইত্যাদি। অভিধর্ম বৌদ্ধ মননশীলতার চরম বিকাশ। সূত্র পিটকে বলা হয়েছে যে, প্রাণী হত্যা করা উচিত নয়, এটা অকুশল কর্ম। এটির পরিণাম দুঃখজনক। কেন প্রাণীহত্যা করা অনুচিত– সূত্র পিটকে এটির মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ ও প্রমাণ পাওয়া কঠিন। অভিধর্ম পিটকেই এটির যথাযথ কারণ ও প্রমাণ প্রদর্শিত হয়েছে। এতে কাল্পনিক কোন বিষয়ের অবতারণা করে মূল বক্তব্যকে চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা নেই। কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের সাহায্যে বক্তব্য বিষয়ের বিশ্লেষণ করাই এটির প্রধান বিশেষত্ব। পূর্বেই বলা হয়েছে অভিধর্মের মূল আলোচ্য বিষয়ে বৌদ্ধ দর্শন ও পরমার্থ সত্য। তাই বুদ্ধের মৌলিক ধর্মদর্শন, উপলব্ধি তথা অবগাহন করার জন্য অভিধর্মের চর্চা ও অনুশীলর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিজ্ঞ বৌদ্ধাচার্যগণ প্রথমে ধর্ম বিনয় শিক্ষা ও অনুশীলন করবার পর অভিধর্ম চর্চা করার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ অভিধর্ম বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জন ছাড়া বুদ্ধের প্রচারিত গম্ভীর মনস্তাত্বিক ধর্ম-দর্শন উপলব্ধি করা কখনো সম্ভব নয়।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২১

বাড়িতে অভিধর্ম পিটকের বাংলা অনুবাদ থাকলে তোমরা একটু চোখ বুলিয়ে আসতে পারো। এছাড়া নিচের লিংক বা QR code থেকে অভিধর্ম পিটকের বাংলা অনুবাদ পেয়ে যাবে।

লিংক -http://banavantey.blogspot.com/2014/03/blog-post.html

QR code-

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২২

অভিধর্ম পিটক বিষয়ে একটি কনসেপ্ট ম্যাপিং করো।

কনসেপ্ট ম্যাপিংয়ে অভিধর্ম পিটকের ভাগ, পুস্তকসমূহের সংখ্যা ও নাম এবং প্রতিটি পুস্তকে নির্দেশিত একটি করে শিক্ষণীয় উপদেশ ছকাকারে লেখো।

কনসেপ্ট ম্যাপিং

কনসেপ্ট ম্যাপিংয়ে ছবি আসবে

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৩

তোমার জীবনে অভিধর্ম পিটকের উপদেশ কীভাবে পালন করবে, তার একটি পরিকল্পনা করো।

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৪

তুমি কীভাবে তোমার পরিবারে সদস্য/সহপাঠীদের তাদের জীবনে অভিধর্ম পিটকের উপদেশ পালন করতে সহায়তা/উদ্বুদ্ধ করবে, তার একটি পরিকল্পনা করো।

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৫

কনসেপ্ট তৈরির অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে তোমার লিখিত মতামত দাও
কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)?
কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)?
সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?
ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)?

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

ফিরে দেখা: নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে এবং না হলে না এর ঘরে (✓) চিহ্ন দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস

এ অধ্যায় শেষে আমরা ধারণা নিতে পারব—

- বিভিন্ন যুগে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ;
- বৌদ্ধধর্মের বিকাশে রাজা ও শ্রেষ্ঠীদের অবদান;
- বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার;
- বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৬

আমরা সবাই মিলে জাদুঘর/পুরোনো বিহার/বৌদ্ধধর্মীয় ঐতিহাসিক স্থানে একটি ফিল্ড ট্রিপে যাব। ফিল্ডট্রিপে যাওয়ার জন্য যা যা প্রস্তুতি নিতে হয় অথবা নির্দেশনা মেনে চলতে হবে, তা শিক্ষক থেকে জেনে নিয়ে নোট করে রাখ।

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে ঐ কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

ফিল্ড ট্রিপে যাওয়া সম্ভব না হলে আমরা ভার্চুয়াল ট্রিপের মাধ্যমে বিকল্প অভিজ্ঞতা অর্জন করতে করতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৭

তোমার ফিল্ডট্রিপের/বিকল্প অভিজ্ঞতাটি লেখো।

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে ঐ কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে। তিনি নেপালের তরাই অঞ্চলের বর্তমান উত্তর প্রদেশের বস্তি জেলার উত্তরে কপিলাবস্তু রাজ্যের শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাজা শুদ্ধোদন এবং মাতার নাম রানি মহামায়া। তাঁর নাম ছিল সিদ্ধার্থ গৌতম। তিনি ২৯ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে ছয় বছর কঠোর ধ্যান-সাধনার পর ৩৫ বছর বয়সে গয়ার অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে মহাজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হন। তিনি দীর্ঘ ৪৫ বছর তাঁর ধর্মমত প্রচার করে ৮০ বছর বয়সে কুশীনারায় পরিনির্বাণ (দেহত্যাগ) লাভ করেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মমত পৃথিবীতে বৌদ্ধধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করে। বুদ্ধের জীবদ্দশায় তাঁর ধর্ম প্রচার-প্রসারে যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন তন্মধ্যে রাজা বিম্বিসার রাজা অজাতশত্রু, রাজা প্রসেনজিৎ, শ্রেষ্ঠী অনাথপিন্ডিক প্রমুখ অন্যতম।

বুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ ষোলটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই রাজ্যগুলোর প্রতিটিকে বলা হতো মহাজনপদ । এই মহাজনপদগুলোতে বুদ্ধ পরিভ্রমণ করে ধর্ম প্রচার করেছেন। মহাজনপদগুলো হলো যথাক্রমে : ১. অঙ্গ, ২.মগধ, ৩. কোশল, ৪, বজ্জি, ৫. কাসী, ৬, মল্ল, ৭. চেতী ৮. বৎস ৯. কুরু, ১০. পাঞ্চাল, ১১. মৎস্য, ১২. সুরসেন, ১৩. অশ্মক, ১৪. অবন্তি, ১৫. গান্ধার এবং ১৬. কম্বোজ। জনপদগুলোর মধ্যে মগধ, কোশল ও বজ্জি ছিল অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী। এসব জনপদে বুদ্ধ বহুবার গমন করে তাঁর ধর্ম প্রচার ও বহু কুলপুত্রকে সঙ্ঘে দীক্ষাদান করেছেন।

শিক্ষার্থীরা একটি বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান (সোমপুর বিহার) দেখছে

বুদ্ধের সমকালীন রাজন্যবর্গ ও শ্রেষ্ঠীদের অবদান

রাজা বিম্বিসার

বুদ্ধের সমকালীন রাজাদের মধ্যে যাঁরা বৌদ্ধধর্মের বিকাশে নানাবিধ অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে রাজা বিম্বিসার, রাজা অজাতশত্রু, রাজা প্রসেনজিৎ ও শ্রেষ্ঠী অনাথপিন্ডিক এবং রাজা বিশাখা অগ্রগণ্য। সিদ্ধার্থ গৌতম গৃহত্যাগের পর রাজা বিম্বিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। রাজা সিদ্ধার্থ গৌতমের সুন্দর সুগঠিত দেহ সৌষ্টব দেখে তাঁকে রাজগৃহে অবস্থান করে রাজ্যের অর্ধাংশে রাজত্ব করার অনুরোধ জানান। সিদ্ধার্থ মহা উপাসিকা বিম্বিসারের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন; কিন্তু রাজার অনুরোধ অনুযায়ী আশ্বস্ত করেন যে, বোধিজ্ঞান লাভের পর তিনি রাজগৃহে আসবেন। এরপর সম্বোধি প্রাপ্তির পর বুদ্ধ দ্বিতীয় বর্ষে রাজগৃহে আগমন করলে রাজা বিম্বিসার তাঁকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর বিম্বিসার তাঁর জীবনব্যাপী বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করেছিলেন। পিটকগ্রন্থ থেকে জানা যায়, বুদ্ধ ভিক্ষু-সঙ্ঘের বহু বিধিবিধান রাজার পরামর্শক্রমে স্থির করতেন। ভিক্ষু-সঙ্ঘের উপোসথ ও বর্ষাবাস, অধিষ্ঠান-বিধি রাজা বিম্বিসারের অনুরোধক্রমেই বুদ্ধ প্রবর্তন করেছিলেন। কথিত আছে, বুদ্ধ বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির দ্বিতীয় বর্ষে রাজগৃহে আগমন করলে রাজা বিম্বিসার উক্ত দিনেই বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সঙ্ঘের বসবাসের জন্য ‘বেলুবন’ (বেণুবন) নামক উদ্যানটি বুদ্ধকে দান করেন। এটি ছিল প্রথম বৌদ্ধ বিহার বা সংঘারাম। রাজা বুদ্ধের কাছে সদ্ধর্ম শ্রবণ করে শ্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। তার স্ত্রী রানি ক্ষেমা দেবীও বুদ্ধের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে ভিক্ষুণী উপসম্পদা গ্রহণ করেছিলেন; ধ্যান-সাধনা করে তিনি অচিরে অর্হত্ত্ব ফল লাভ করেন। বুদ্ধ তাকে ‘প্রজ্ঞায় অগ্রগণ্য’ অগ্রশ্রাবিকার স্থান দিয়েছিলেন।

রাজা বিম্বিসার একজন সুদক্ষ, বিচক্ষণ ও সফল শাসক ছিলেন। তিনি তাঁর চিকিৎসক জীবককে বুদ্ধের চিকিৎসা সেবায় নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে শুধু ভিক্ষুসঙ্ঘ নয়, প্রজাসাধারণসহ অন্য ধর্মানুসারী তীর্থিকগণও পরম সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি জনসাধারণের কল্যাণে বহু জনহিতকর কাজ করেছিলেন।

রাজা অজাতশত্রু

রাজা অজাতশত্রু ছিলেন বিম্বিসারের পুত্র। বুদ্ধের পরিনির্বাণের আট বছর পূর্বে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। অজাতশত্রু প্রথমে দেবদত্তের প্ররোচনায় বুদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। এমনকি বুদ্ধের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলেন। পিতা বিম্বিসারকে কারাগারে নিক্ষেপ করে নির্যাতন করেন। নির্যাতনের ফলে রাজা বিম্বিসার কারাগারে যেদিন মৃত্যুবরণ করেন, সেদিন অজাতশত্রুর এক পুত্রসন্তানের জন্ম হলে তিনি পিতৃস্নেহ অনুভব করে অনুশোচনায় মর্মাহত হয়ে পড়েন। তাঁর এই মর্মবেদনা উপশমের জন্য রাজবৈদ্য জীবকের পরামর্শক্রমে বুদ্ধের নিকট উপনীত হন। বুদ্ধের নিকট 'সামঞ্ঞফলসুত্ত' দেশনা শুনে অজাতশত্রু বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেন। তখন থেকে তিনি বুদ্ধের একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে পড়েন। বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার পর তিনি আজীবন সদ্ধর্মের প্রচার প্রসার ও কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তিনি বহু বিহার নির্মাণ ও সংস্কার করেছিলেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের সংবাদ শুনে তিনি অতিশয় মর্মাহত হয়ে পড়েন এবং তাঁর দেহাবশেষের অংশ (দেহধাতু) এনে সুরম্য চৈত্য নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে মহাকাশ্যপ স্থবিরের পরামর্শক্রমে রাজা অজাতশত্রু বিভিন্ন রাজ্যের বুদ্ধের পূতাস্থিসমূহ সংগ্রহ করে রাজগৃহের দক্ষিণদিকে নিধান করেছিলেন।

রাজা অজাতশত্রুর উল্লেখযোগ্য অবদান হলো বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বুদ্ধবাণীসমূহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর বুদ্ধের উপদিষ্ট ধর্ম বিনয় সংগ্রহ ও সংক্ষণের প্রয়োজন দেখা দেয়। মহাকাশ্যপ প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ভিক্ষু সঙ্ঘের পরামর্শক্রমে অজাতশত্রু রাজগৃহের সপ্তপণী গুহায় ধর্মবিনয়ে পারঙ্গম পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষুর সমন্বয়ে প্রথম সংগীতি আয়োজন করেন। এতে বুদ্ধবাণীসমূহ আবৃত্তি করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে 'ধম্ম-বিনয়' নামে সুবিন্যস্ত করে সংগৃহীত হয়। রাজা অজাতশত্রুর অবদান বৌদ্ধধর্মের বিকাশে নিঃসন্দেহে অবিস্মরণীয়। তাঁর বত্রিশ বছর রাজত্বকালে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন।

রাজা প্রসেনজিৎ

কোশল রাজা প্রসেনজিৎ ছিলেন বুদ্ধের সমবয়সী। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি বুদ্ধের একনিষ্ঠ ভক্ত হন এবং আজীবন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সংযুক্ত নিকায়ে রাজা প্রসেনজিতকে একজন অত্যন্ত সফল, নিরহংকার ও প্রজাবৎসল শাসকরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর প্রধান মহিষী মল্লিকাদবী বুদ্ধের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তিনিই রাজাকে বুদ্ধের কাছে নিয়ে যান। বুদ্ধের উপদেশ শুনে রাজা শ্রদ্ধান্বিত হয়ে তাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, 'ভন্তে, আজ হতে আমাকে আপনার উপাসক হিসেবে গ্রহণ করুন; আমি আপনার শরণ গ্রহণ করলাম।' রাজা প্রতিদিন তিনবার বুদ্ধ ও ভিক্ষু সঙ্ঘকে দর্শন করার জন্য বিহারে যেতেন। তখন ধর্মীয় আলোচনার সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা হতো। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, বুদ্ধ ও অজাতশত্রুর মধ্যে আন্তরিক হৃদ্যতা ছিল এবং রাজা বুদ্ধকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। বুদ্ধ ও রাজা উভয়ে কোশলজাত ক্ষত্রিয় বংশের বলে রাজা গৌরববোধ করতেন। রাজা প্রসেনজিৎ 'রাজাকারাম' নামে

একটি বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেছিলেন। তিনি প্রতিনিয়ত বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করতেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁর দানকে 'অসমদান' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত রাজন্যবর্গ ছাড়া যে সকল রাজা বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে রাজা উদয়ন, রাজা চন্দ্র প্রদ্যোত, রাজা পুক্কুসাতি, রাজা রুদ্রায়ন অন্যতম। তাঁরা সকলেই বুদ্ধের একান্ত ভক্ত ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মের বিকাশে বিহারাদি নির্মাণসহ নানাবিধ কার্য সম্পাদন করেছিলেন।

বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও বিকাশ সাধনে শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠী অনাথপিন্ডিক এবং মহোপসিকা বিশাখার অবদানও উল্লেখযোগ্য। অনাথপিন্ডিক ছিলেন শ্রাবস্তীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি রাজগৃহের এক বন্ধুর মাধ্যমে বুদ্ধ সম্পর্কে অবহিত হয়ে বুদ্ধের শরণাগত হন। শ্রাবস্তীর জেত রাজকুমারের একটি মনোরম উদ্যান ছিল। শ্রেষ্ঠী উক্ত উদ্যান ক্রয় করে বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান করার জন্য জেত কুমারের নিকট প্রস্তাব করলেন। জেত রাজকুমার উক্ত উদ্যানজুড়ে স্বর্ণমূদ্রা বিস্তারের বিনিময়ে বিক্রয় করতে রাজি হলেন। আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা বিছানোর পর কিছু পরিমাণ স্থান অনাবৃত ছিল। অবস্থায় কুমার উক্ত অনাবৃত স্থান নিজে দান করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রায় আবৃত স্থান শ্রেষ্ঠীকে বিক্রি করলেন। শ্রেষ্ঠী আরো আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে সেই উদ্যানে একটি মনোরম সুরম্য বিহার নির্মাণ করে আরো আঠারো কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে তিন মাস ব্যাপী মহোৎসবের মাধ্যমে উক্ত বিহার বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করেন। পালি সাহিত্যে এই বিহারের নাম 'অনাথপিন্ডিকের জেতবনারাম'। ভগবান বুদ্ধ এই বিহারে উনিশ বর্ষা অবস্থান করে বহু ধর্ম বিনয় প্রজ্ঞাপ্ত করেছিলেন। অপরদিকে শ্রাবস্তীর মিগার শ্রেষ্ঠীর পুত্র পুণ্যবর্ধনের স্ত্রী বিশাখা বাল্যকাল থেকে বুদ্ধের উপাসিকা ছিলেন। তিনি মাত্র সাত বছর বয়সে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বিশাখার শ্বশুর বাড়ির সকলেই নগ্ন তীর্থিকদের অনুসারী ছিলেন। বিশাখার প্রচেষ্টায় তাঁরা বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশাখার অবদান অসামান্য। তিনি তাঁর নয় কোটি মূল্যের মহালতা স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে 'পূর্বারাম' নামে একটি মহাবিহার নির্মাণ করে দান করেন। তিনি প্রতিদিন তিনবার বিভিন্ন খাদ্য ভোজ্য ও পূজার উপকরণ নিয়ে বিহারে যেতেন। তিনি বুদ্ধের কাছে আটটি বর নিয়েছিলেন; তিনি প্রতিদিন পাঁচ শ ভিক্ষুকে অন্নদান করতেন, আগন্তুক ভিক্ষুকে আহার্যদান করতেন, অসুস্থ ভিক্ষুর ঔষধ-পথ্য দান ও সেবা শুশ্রুষা করতেন, বর্ষা চীবর দিতেন এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি দান করতেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে তিনি 'মহা-উপাসিকা বিশাখা' নামে পরিচিত।

মৌর্যযুগে বৌদ্ধধর্ম (খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক)

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে মৌর্যসম্রাট মহামতি অশোকের অবদান এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। মৌর্য বংশের প্রথম সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তাঁর মন্ত্রী চাণক্যের (কৌটিল্য) সহায়তায় নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন এবং এক বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। তাঁর রাজ্যসীমা দক্ষিণে মহীশূর, উত্তর-পশ্চিমে পারস্যের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি একজন সুদক্ষ সামরিক সংগঠক ও প্রশাসক ছিলেন। তিনি নিজে জৈন ধর্মের অনুসারী হলেও তাঁর রাজত্বকালে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অগ্রযাত্রা অব্যাহত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তাঁর পুত্র বিন্দুসারের ওপর রাজত্বভার অর্পণ করে মহীশূরে চলে যান।

বিন্দুসার অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করেছিলেন। তিনি পিতার মতো পারস্য সীমান্তের গ্রিকদের সঙ্গে সম্প্রীতির সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন শান্তিকামী ও শিক্ষার প্রতি অনুরাগী। বিন্দুসারের রাজত্বকালে তক্ষশীলায় একবার প্রজাবিদ্রোহ হলে তিনি তাঁর পুত্র অশোককে বিদ্রোহ দমনে পাঠিয়েছিলেন। বিন্দুসারের অনেক পুত্র কন্যা ছিল। পঁচিশ বছর রাজত্ব করার পর বিন্দুসারের মৃত্যু হলে অশোক সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে মহামতি সম্রাট অশোকের অবদান অনেক। অশোক প্রথম জীবনে বৌদ্ধধর্মের প্রতি তেমন অনুরাগী ছিলেন না। পিতার মৃত্যুর পর অশোক কলিঙ্গ দেশ জয় করতে যান যুদ্ধে লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটে এবং দেড় লক্ষ মানুষ আহত ও বন্দি হয়। যুদ্ধের বিভীষিকা দেখে অশোক ভীষণভাবে মর্মাহত হন। তারপর ন্যাগ্রোধ শ্রামণের কাছে বুদ্ধবাণী শুনে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধধর্মের উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। তখন তাঁর নাম হয় 'ধর্মাশোক'। প্রকৃতপক্ষে কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোকের জীবনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে। এই যুদ্ধ ছিল মৌর্যযুগে শেষ বৃহৎ যুদ্ধ। এরপর ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়; দিগ্বিজয়ের পরিবর্তে শুরু হয় ধর্মবিজয়।

সম্রাট অশোক

অশোক জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে, পর্বতের গায়ে গুহায় বুদ্ধের অনুশাসন খোদাই করে প্রচার করার ব্যবস্থা করেন। এসব উপদেশের মধ্যে প্রাণিহত্যা থেকে বিরতি, জীবগণের ক্ষতিসাধন থেকে বিরতি, মাতা-পিতা ও গুরুজনের সেবা ও গৌরব করা, শ্রামণ-ব্রাহ্মণ ও গরিবদুঃখী জনকে দান করা, ভৃত্যদের প্রতি সদয় থাকা, মিতব্যয়ী হওয়া ইত্যাদি অন্যতম। অশোকের এসব খোদিত উপদেশ বাণীকে 'শিলালিপি' বলা হয়। অশোক সব ধর্মের প্রতি উদার ছিলেন। তিনি ধর্মগুরুকে মুক্ত হস্তে দান করতেন। তিনি ভগবান বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো দর্শন ও চিহ্নিত করে বিহার, স্তম্ভ ও চৈত্য নির্মাণ করেন। অশোক তাঁর রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে বুদ্ধের দেহাস্থি প্রতিষ্ঠা করে স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। বুদ্ধের ৮৪ হাজার ধর্মস্কন্ধকে

স্মরণ ও পূজা করার জন্য অশোক রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ৮৪ হাজার স্তম্ভ বা চৈত্য ও বিহার নির্মাণ করেন। অশোকের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হলো তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতির আয়োজন। এটি অনুষ্ঠিত হয় রাজধানী পাটলিপুত্রে। এই সংগীতির মাধ্যমে বৌদ্ধ সঙ্ঘ কলুষমুক্ত হয় এবং বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য ধর্মদূত প্রেরণ করা হয়। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে শ্রীলংকায় একটি বোধিবৃক্ষের শাখাসহ পাঠানো হয়। এ বোধিবৃক্ষের শাখা শ্রীলংকার অনুরোধপুরে রোপণ করা হয়, যেটি এখনো বিদ্যমান।

তৃতীয় সংগীতির একটি অংশ

মহামতি অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারের জন্য ধর্মমহামাত্র, পুলিসে, রজ্জুক, যুক্ত প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা রাজ্যে বিভিন্ন ধর্মসহ বৌদ্ধধর্মের উন্নয়নে তদারকি করতেন। অশোকের সময়েই ভারতবর্ষ ছাড়াও জাভা, সুমাত্রা, তিব্বত, আফগানিস্তান, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে ধর্ম প্রচারক প্রেরণ করেছিলেন। তিনি দেবপ্রিয় (দেবানংপিয়) অশোক নামেও খ্যাত।

কুষাণযুগে বৌদ্ধধর্ম (খ্রিষ্টীয় প্রথম শতক)

মৌর্য সাম্রাজ্যের অবসানের পর শুঙ্গ বংশীয় রাজারা মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁরা বৌদ্ধধর্মের প্রতি সদয় ছিলেন না। শুঙ্গ বংশের পর মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন কুষাণ বংশীয় রাজন্যবর্গ। এ বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন সম্রাট কনিষ্ক। সম্রাট অশোকের মতো তিনি প্রথম জীবনে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন না। স্থবির পার্শ্বকের সংস্পর্শে এসে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রবল অনুরাগী হন এবং বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে আপ্রাণ প্রয়াসী হন। সম্রাট কণিষ্ক খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন ভিক্ষুসঙ্ঘ বিভিন্ন নিকায় ও মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। সম্রাট কণিষ্ক বিভিন্ন নিকায়ের পণ্ডিত ও প্রাজ্ঞ ভিক্ষুদের জলান্ধরে সমবেত

করে সংগীতির আয়োজন করেন। তিনি এখানে কুণ্ডলবন নামে এক বিশাল বিহার নির্মাণ করে সংগীতির ব্যবস্থা করেন। এটি বৌদ্ধ সাহিত্যে 'কণিষ্ক সংগীতি' নামে অভিহিত। এ সংগীতির সভাপতি ছিলেন মহাপন্ডিত বসুমিত্র এবং সহসভাপতি ছিলেন অশ্বঘোষ। এতে পাঁচশ জন ভিক্ষু অংশগ্রহণ করেন। এই সংগীতিতে পালি ভাষার পরিবর্তে বুদ্ধবাণী সংস্কৃত ভাষায় সংকলন করা হয়। সংস্কৃত ভাষায় তিন লক্ষ শ্লোকে রচিত বৌদ্ধ শাস্ত্র উপদেশ, বিভাষা ও অভিধর্ম ভাষ্য নামক তিনখানা ভাষ্যগ্রন্থ সংকলিত হয়। সংগীতি শেষে বিভাষা শাস্ত্রগুলো তাম্রপটে খোদাই করে একটি লোহার বাক্সে আবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হয়। দুর্ভাগ্য যে, সেই তাম্রপটগুলোর সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি।

সম্রাট কণিষ্ক

কণিষ্ক সংগীতি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে 'চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতি' নামে অভিহিত। এ সংগীতিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘ প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি হীনযান বা থেরবাদ সম্প্রদায়, অপরটি মহাযান বা মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়। এ দুটি সম্প্রদায় এখনো বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান। এই সংগীতিতে মূলত মহাযান পন্থী ভিক্ষুরাই প্রাধান্য পায়। থেরবাদী কোনো গ্রন্থে এ সংগীতিকে স্বীকার করা হয়নি। চতুর্থ সংগীতির পর থেকে মহাযান ধর্মমতের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটে। সম্রাট কনিষ্কও মহামতি অশোকের মতো চতুর্থ সংগীতি শেষে বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারক প্রেরণ করেন, যার ফলে চীন, জাপান, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার লাভ করে। সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেও কণিষ্কের অবদান অমরতা লাভ করেছে। পার্শ্বক, বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, সংঘরক্ষক, মাঠর প্রমুখ খ্যাতনামা পন্ডিত ও সাহিত্যিকগণ তাঁর রাজসভা অলংকৃত করে রাখতেন। কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বপ্রথম বুদ্ধমূর্তির নির্মাণ ও বৌদ্ধ শিল্পকলার বিকাশ ঘটে। গান্ধার শিল্পকলায় বুদ্ধমূর্তির নির্মাণ সর্বপ্রথম কণিষ্কের সময়ে শুরু হয়। মথুরা শিল্পকলা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রেও কণিষ্কের অবদান রয়েছে।

কুষাণ যুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কণিষ্ক একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে বৌদ্ধধর্ম, সাহিত্য ও বৌদ্ধ শিল্পকলার বিকাশে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন বটে, অন্যান্য ধর্মের প্রতিও তিনি উদারনীতি অবলম্বন করতেন। সম্রাট কণিষ্ক ধর্ম-মত নির্বিশেষে সকলের গ্রহণযোগ্য নৃপতি ছিলেন।

গুপ্তযুগে বৌদ্ধধর্ম (আনুমানিক খ্রি: তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতক)

মগধকে কেন্দ্র করে খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথমার্ধে গুপ্ত সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীগুপ্ত। এ বংশের শাসকগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমর্থক। তবে তাঁরা বৌদ্ধধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ও উদার ছিলেন। গুপ্ত যুগে কোনো কোনো সম্রাট বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। শ্রীগুপ্ত বরেন্দ্রে মৃগস্থাপন স্তূপের কাছে চীনা ভিক্ষুদের জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

শ্রীগুপ্তের পুত্র সমুদ্র গুপ্ত একজন দক্ষ শাসক ও যোদ্ধা ছিলেন। তিনি গ্রন্থকার পণ্ডিত বসুবন্ধুর কাছে বৌদ্ধদর্শন শিক্ষা গ্রহণ করেন। সিংহল রাজ মেঘবর্ণের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। মেঘবর্ণের অনুরোধক্রমে তিনি বুদ্ধগয়ার একটি বিহার নির্মাণের অনুমতি দেন। সমুদ্র গুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (৩৯৯-৪১০ খ্রি.) ভারত ভ্রমণে আসেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ কাহিনিতে দ্বিতীয় সমুদ্রগুপ্তের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তার বিবরণে জানা যায়, তখন বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম সগৌরবে বিরাজ করত। বহু বিহারে শত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করতেন। মথুরা, বারাণসীসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা অব্যাহত ছিল। গুপ্তযুগে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিচর্চাসহ শিল্প ভাস্কর্যে চরম বিকাশ সাধিত হয়েছিল। নালন্দা মহাবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত গৌরব ও সমৃদ্ধি গুপ্তযুগেই ঘটেছিল।

হিউয়েন সাঙের বিবরণে জানা যায়, গুপ্তরাজ বংশের পাঁচজন রাজা নালন্দায় পাঁচটি সংঘারাম নির্মাণ করেছিলেন। তাঁরা একটি সুউচ্চ মন্দিরও নির্মাণ করেন। এখানে বালাদিত্য নির্মিত সংঘারামটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নালন্দা বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পায় গুপ্তযুগে। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ দিক থেকে এটি ধর্মীয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বখ্যাতি লাভ করে এবং এটির জনপ্রিয়তা ভারতবর্ষসহ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এটি বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠলেও এখানে বেদ, বেদান্ত, দর্শন, ব্যাকরণ, উপনিষদ, মীমাংসা, চিকিৎসা শাস্ত্র, গণিত, যোগশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। হিউয়েন সাঙ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ বছর বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন।

গুপ্তযুগে বৌদ্ধ শিল্পকলারও ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল। গুপ্তযুগের বৌদ্ধ স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন মহারাষ্ট্রের অজন্তা, ইলোরা, ঔরঙ্গাবাদ, মধ্যপ্রদেশের বাঘ গুহায় দেখা যায়। অজন্তার গুহায় অন্তত বিশটি বিহার বা সংঘারাম গুপ্তযুগে নির্মিত। এখানকার গুহাগুলো চমৎকার অলংকার ভূষিত। গুপ্তযুগে বৌদ্ধ ভাস্কর্যের প্রধান দুটি কেন্দ্র হলো মথুরা ও সারনাথ। মথুরায় লাল বেলে পাথরে এবং ঈষৎ হলুদ বর্ণে নির্মিত বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি অতি চমৎকার। গুপ্তযুগে নির্মিত বহু বৌদ্ধমূর্তি মথুরায় পাওয়া গেছে।

সারনাথে পাওয়া বুদ্ধমূর্তিগুলো গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের নিদর্শন। মূর্তিগুলোর মধ্যে প্রশান্তি ও সন্তোষের এক অপূর্ব ছবি ফুটে উঠেছে। সারনাথে বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের বিষয়টি একটি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তির দ্বারা স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে। বজ্রাসনে উপবিষ্ট এই মূর্তিটিতে হাত দুটি ধর্মচক্র মুদ্রায় বুকের কাছে তোলা রয়েছে। এর মধ্যে আধ্যাত্মিকতার বহিঃপ্রকাশ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বিহারের গ্রামে চুনারের বেলে পাথরে নির্মিত পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের একটি বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ মূর্তিটির দেহসৌষ্ঠব অতি মসৃণ, মার্জিত, সুকুমার অঙ্গসৌষ্ঠব, শান্তসৌম্য ধ্যান গম্ভীর দৃষ্টি এবং দেহে রেখা প্রবাহের ধীর সংযত গতি সমকালের শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শন।

অজন্তার গুহাগুলোর মধ্যে কমপক্ষে পাঁচটি গুহায় গুপ্তযুগের চিত্রশিল্প রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রথম গুহায় অঙ্কিত বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের পদ্মপাণি মূর্তিটি অনুপম সৌন্দর্যে চিত্রায়িত। মূর্তিটির ভঙ্গিমা ও চিত্রণপ্রণালি অতি চমৎকার।

বর্ধনযুগে বৌদ্ধধর্ম (খ্রি. ৬০৬-৬৪৭ অব্দ)

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর পুষ্যভূতি বংশীয় রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। বানভট্টের হর্ষচরিত, চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণ, বিভিন্ন শিলালিপি ও অনুশাসন থেকে জানা যায় যে, হর্ষবর্ধন এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম জীবনে তিনি শৈবধর্মের অনুসারী ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ দীর্ঘ ষোল বছর (খ্রিষ্টীয় ৬২৯-৬৪৫ অব্দ) ভারতবর্ষে অবস্থান করে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা অবলোকন করেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, হীনযান ও মহাযান ধর্মমতের দশ হাজারের অধিক ভিক্ষু বিভিন্ন বিহারে বাস করতেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, হর্ষবর্ধন বৌদ্ধ পন্ডিত ও জ্ঞানী-গুণীদের সভা আহ্বান করে ধর্মালোচনা শ্রবণ করতেন এবং যুক্তিতর্কের আয়োজন করতেন। তর্কে বিজয়ীকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করতেন। তিনি দেশে পশুহত্যা নিষেধ করেছিলেন এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে সরাইখানা, হাসপাতাল, বিশ্রামাগার প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। তিনি দেশের সর্বত্র বহু বিহার ও চৈত্য নির্মাণ করেছিলেন। হর্ষবর্ধন এলাহাবাদের প্রয়াগে একাট বিশাল মন্দিরযুক্ত বিহার নির্মাণ করে এক বিশাল মেলার আয়োজন করেন। এই মেলা প্রতি পাঁচ বছর পরপর অনুষ্ঠিত হতো। এই মেলায় বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ বিভিন্ন ধর্মের সাধু-সন্ন্যাসীকে আহ্বান করে ধর্মালোচনা করা হতো এবং অকাতরে দান দেওয়া হতো। রাজা হর্ষবর্ধন এ সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু এবং দীনদরিদ্রকে উদার হস্তে দান করতেন, এমনকি নিজের পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত দান করে নিঃস্ব হয়ে ফিরে যেতেন।

হর্ষবর্ধন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বৌদ্ধশাস্ত্রসহ বিভিন্ন বৈষয়িক বিদ্যাশিক্ষার প্রধান পীঠস্থান। তখন এটির মহা আচার্য বা অধ্যক্ষ ছিলেন বাঙালি দার্শনিক ভিক্ষু শীলভদ্র। তিনি চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের গুরু ছিলেন। হর্ষবর্ধন নালন্দায় একটি বিহার ও পিতলের মন্দির নির্মাণ করান। বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে রাজা হর্ষবর্ধনের অবদান ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

পাল যুগে বৌদ্ধধর্ম (খ্রিষ্টীয় ৭৫০-১১৬৫ অব্দ)

রাজা হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর প্রায় শতাধিক বছর বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার একপ্রকার স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলাদেশে ভীষণ রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। তখন সমগ্র দেশে কোনো রাজা ছিল না। চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করত। এ অবস্থাকে বলা হতো 'মাৎস্যন্যায়'। মাৎস্যন্যায় বলতে ন্যায়-নীতিহীন অবস্থাকে বুঝায়। এ সময়ে কোনো ন্যায়-নীতি বলতে কিছু ছিল না। দেশের সর্বত্র দুর্নীতি অবিচার অনাচার বিরাজ করতো। এমন দুর্বিষহ অবস্থায় বাংলার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল নামের একজন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। তিনি পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি হলেন বাংলার প্রথম নির্বাচিত রাজা। তিনি বিশ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল রাজপদে অভিষিক্ত হয়ে পঁয়ত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দেবপাল রাজা হন। এভাবে পালবংশীয় রাজারা প্রায় চার শ বছর রাজত্ব করেন। পরবর্তী রাজাদের মধ্যে প্রথম মহীপাল, নয়পাল, দ্বিতীয় মহীপাল, রামপাল, মদন পালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাল বংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন

গোবিন্দপাল। পালবংশের সব রাজাই ছিলেন বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের প্রতিও তারা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে। গোপাল নালন্দায় একটি বিহার দান করেন এবং ওদন্তপুর মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। তিব্বতী ইতিহাসবিদ তারনাথ উল্লেখ করেছেন যে, ধর্মপাল দেশে পঞ্চাশটির বেশি বিহার নির্মাণ করেছিলেন, এর মধ্যে বিক্রমশীলা মহাবিহার ছিল আন্তর্জাতিক মানের। এই বিহারের চারদিকে ১০৭টি ছোট মন্দির ছিল। এটি ছিল নালন্দার মতো একটি উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র। এখানে ১১৪ জন অধ্যাপক (আচার্য) হাজার হাজার দেশি বিদেশি শিক্ষার্থীকে পাঠদান করতেন। ধর্মপালের আর একটি স্মরণীয় কীর্তি নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহার প্রতিষ্ঠা। এটি ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত একক বৃহত্তম বিহার। দেবপালের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা মহাবিহার, বিক্রশীলা মহাবিহার ও সোমপুর মহাবিহার পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রথম মহীপাল, নয়পাল, রামপাল প্রমুখ পাল বংশীয় রাজন্যবর্গ প্রত্যেকে বৌদ্ধধর্ম, শিল্প, সাহিত্য সংস্কৃতি ইত্যাদির বিকাশে সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তাই পালবংশের রাজত্বকালকে বৌদ্ধ ধর্মের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়।

পাল রাজাদের শাসনামলে বাংলার বিখ্যাত পন্ডিত অতীশ দীপঙ্কর তিব্বত রাজের আমন্ত্রণে তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন।

পাল যুগে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ বা বৌদ্ধ গান ও দোহা রচিত হয়। চর্যাপদের রচনাকাল খ্রিষ্টীয় অষ্টম থেকে একাদশ শতক বলে বিবেচনা করা হয়। পাল রাজাদের সময়ে বৌদ্ধ স্থাপত্য ও শিল্পকলারও প্রভূত উন্নতি লাভ করে।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম কখন এবং কীভাবে প্রচার-প্রসার লাভ করেছে তার সঠিক তথ্য কিংবা সন-তারিখ নির্ণয় করা কঠিন। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায়, বুদ্ধ কর্ণসুবর্ণে ও সমতটে সাত দিন এবং পুণ্ড্রবর্ধনে তিন মাস অবস্থান করে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও পুণ্ড্রবর্ধন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের নাম, যেগুলো বুদ্ধের জন্মস্থান মগধের কাছাকাছি। কাজেই গৌতম বুদ্ধের বাংলায় আগমন করে ধর্ম প্রচার করা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত বলে ইতিহাসবিদরা মনে করেন। দীপবংস ও মহাবংস গ্রন্থ থেকে জানা যায়, সম্রাট অশোক তৃতীয় সংগীতির পর সোণ ও উত্তর থেরকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য মিয়ানমার পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁরা চট্টগ্রাম হয়ে মিয়ানমারে যাওয়ার সময় এখানে বুদ্ধের ধর্ম প্রচার করেন। এছাড়া পুণ্ড্রবর্ধন সম্রাট অশোকের শাসনাধীন ছিল বলে ধারণা করা হয়। অশোক ভারতবর্ষের এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। ধারণা করা যায়- এসময়ে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে। এছাড়া বিখ্যাত বৌদ্ধ প্রত্নস্থল সাঁচীতে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে প্রজ্ঞাপ্ত একটি অনুশাসন থেকে জানা যায় বাংলার পুণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলের ধর্মদিন্না নামের এক উপাসিকা ও ঋষিনন্দন নামের একজন উপাসক সাঁচীস্তূপের তোরণ ও দেয়াল নির্মাণের জন্য অর্থদান করেছিলেন। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে নির্মিত বৌদ্ধ প্রত্নতীর্থ নাগার্জুনকোন্ডায় প্রাপ্ত একটি শিলালিপি থেকে জানা যায়, সে সময় বাংলা বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রধান প্রাণকেন্দ্র ছিল।

খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পাল বংশ, খড়্গ বংশ, দেব বংশ ও চন্দ্র বংশের রাজারা রাজত্ব করতেন। পাল রাজবংশের রাজারা সকলেই ছিলেন বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ ঘটে। খড়্গ বংশের চারজন রাজা

সমতটে রাজত্ব করতেন। এই বংশের তৃতীয় রাজা রাজভট্ট ছিলেন ত্রিরত্নের প্রতি অতি শ্রদ্ধাশীল। তখন সমতটে চারহাজার ভিক্ষু-ভিক্ষুণী বাস করতেন। এ বংশের রাজারা বহু বিহার ও বুদ্ধ মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন।

খড়গ বংশের পর দেববংশীয় রাজারা খ্রিষ্টীয় ৭২০-৮১৫ অব্দ পর্যন্ত সমতটে রাজত্ব করেন। এ বংশের শান্তিদেব, বীরদেব, আনন্দদেব ও ভবদেব নামে চারজন রাজা রাজত্ব করেন। তাঁরা সকলেই বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন এবং তাঁদের রাজধানী ছিল সমতটের দেবপর্বতে।

এদিকে নবম শতকের মাঝামাঝি সময়ে চট্টগ্রামে দেববংশীয় তিনজন বৌদ্ধ রাজা শাসন করেছিলেন। তাঁরাও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। এ বংশের রাজা কান্তিদেবের সময়ের রাজধানী বর্ধমানপুরে ১৯২৭ সালে ৬৬টি পিতলের বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে পাল সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলাদেশে সেন ও বর্মণ বংশের হিন্দু রাজারা শাসনভার গ্রহণ করেন। এ সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারীরা পৃষ্ঠপোষকতা পেতে থাকে, অপরদিকে বৌদ্ধরা বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হতে থাকে। এ সময়ে বৌদ্ধরা তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করতে পারত না; ফলে বৌদ্ধরা ধীরে ধীরে হীনবল হয়ে পড়ে। বর্মণযুগে জাতবর্মার সময়ে সোমপুর মহাবিহার ধ্বংস হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।

আবার ত্রয়োদশ শতকে সেন ও বর্মনযুগের পর বাংলাদেশ ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদে তুর্কিসেনাদের দখলে চলে যায়। এ সময় বৌদ্ধরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।

পালবংশীয় রাজাদের পতনের পর আঠারো শতক পর্যন্ত বাংলায় বৌদ্ধদের ইতিহাস অনেকটা তমসাবৃত। এ সময়ে দুজন খ্যাতনাম বৌদ্ধ ভিক্ষুর অবদান সম্পর্কে জানা যায়। একজন হলেন চকরিয়ার চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে মগধবাসী দীপঙ্কর মহাস্থবিরের নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করে তিনি নবীন বয়সে ধর্মবিনয় শিক্ষা করার জন্য ব্রাহ্মদেশের মৌলমেইনে গমন করেন। সেখানে বিশ বছর ধর্মবিনয় শিক্ষা করে সেদেশের দশজন ভিক্ষুসহ একখানা চক্রাসন, তিনটি ত্রিভঙ্গ বুদ্ধমূর্তি ও কয়েক খণ্ড বুদ্ধাস্থি নিয়ে আগরতলা হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি আগরতলার লালমাই পাহাড়ে উপনীত হয়ে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির সেখানে পাঁচ বছর অবস্থান করার পর চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড়ের উচ্চতম শিখরে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তার সঙ্গে আনীত একটি বুদ্ধমূর্তি প্রতিস্থাপন করেন। তখন থেকে এই পাহাড় চন্দ্রশেখর পাহাড় নামে পরিচিতি লাভ করে। এরপর চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির পটিয়া থানার অন্তর্গত শ্রীমতী নদীর তীরে হাইডমজা নামের জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির আমবাগানে উপনীত হন। হাইডমজা মহাস্থবিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন এবং তিন দিনব্যাপী ধর্মসভার আয়োজন করেন। ইতিমধ্যে হাইডমজা জানতে পারেন যে, চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির চকরিয়া নিবাসী চেন্দির পুত্র। তিনি চেন্দির নিকট লোক মারফত পুত্রের আগমন সংবাদ প্রেরণ করেন।

পুত্রের আগমন সংবাদ শুনে পিতা তাঁকে সসম্মানে চকরিয়ায় নিয়ে যান এবং বিভিন্ন স্থানে সদ্ধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। হাইডমজার অনুরোধক্রমে চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির চক্রাসনটি তাঁকে প্রদান করেন। জমিদার হাইডমজা চক্রাসনটি প্রতিষ্ঠা করে তার ওপর একটি স্তূপ বা মন্দির নির্মাণ করেন। এই চক্রাসনকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে বিশাল চক্রশালা মেলা বসে।

চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির দ্বিতীয় বুদ্ধমূর্তি ঠেগরপুনি গ্রামে অবস্থানরত তাঁর পিতৃব্য রাজমঙ্গল মহাস্থবিরকে প্রদান করেন। রাজমঙ্গল মহাস্থবির সেই বুদ্ধমূর্তি বোধিবৃক্ষের উত্তর পাশে কাঠের গৃহ নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা করেন। যেটি এখনো 'বুড়া গোঁসাই' নামে হাজার হাজার নর-নারী কর্তৃক পূজিত হচ্ছেন। এই মূর্তিকে কেন্দ্র করে প্রতি মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে সপ্তাহব্যাপী বুড়া গোঁসাইয়ের মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

তৃতীয় বুদ্ধমূর্তিটি মহাস্থবিরের শিষ্য উরল স্থবিরকে প্রদান করেন। উরল স্থবির এটি চট্টগ্রাম শহরের রংমহল পাহাড়ে একটি চৈত্য নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে এটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে আসাম বেঙ্গল রেল কোম্পানির রাস্তা নির্মাণ করার সময় ত্রিভঙ্গ বুদ্ধমূর্তির উপরের অংশ পাওয়া যায় এবং এটি চট্টগ্রামের নন্দন কানন বৌদ্ধ বিহারে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

অষ্টাদশ শতকে কদলপুরের চাইঙ্গা স্থবির বৌদ্ধতীর্থ দর্শন করার জন্য বার্মা ভ্রমণে গমন করেন। তিনি রেঙুন, প্রোম, মৌলমেন ভ্রমণ শেষে আরাকানের বিখ্যাত মহামুনি বিগ্রহ দর্শন করে অভিভূত হন। তিনি এরকম বিগ্রহ নির্মাণ করার জন্য এটির একটি প্রতিকৃতি অঙ্কন করে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে মহামুনি পাহাড়তলি গ্রামে আরাকানের মহামুনি বিগ্রহের অনুকরণে একটি মূর্তি নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষ কারিগর দিয়ে এটি নির্মাণ করাতে ছয় মাস সময় লেগেছিল। আরাকানের মহামুনি মূর্তির অনুকরণে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল বলে এ বিগ্রহের নামকরণ করা হয় মহামুনি বিগ্রহ। পরবর্তী ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে বহু খ্যাতনামা ভিক্ষু সংঘের উপস্থিতিতে মহাসমারোহে বুদ্ধমূর্তির জীবন সঞ্চার করা হয়। এর পর চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে পক্ষকালব্যাপী মহামুনি মন্দির ও বিগ্রহকে কেন্দ্র করে বড়ুয়া, চাকমা, মারমাসহ বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের মানুষের সমাগমে বিশাল মেলা বসে। যার ধারাবাহিকতা এখনো চলমান। এই মহামুনি মন্দির প্রতিষ্ঠায় কক্সবাজার এলাকার পালংয়ের ধর্মপ্রাণ জমিদার কুঞ্চধামাই এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র কেওজচাই চোধুরী সক্রিয় পৃষ্ঠাপোষকতা করেন।

বাংলাদেশে বসবাসরত বৌদ্ধদের মধ্যে ছোট-বড় বহু নৃগোষ্ঠী রয়েছে। যেমন: বড়ুয়া, চাকমা, মারমা, রাখাইন, তঞ্চঙ্গ্যা, খিয়ং, চাক, ওঁরাও ইত্যাদি। বড়ুয়া নৃগোষ্ঠী প্রধানত চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা অঞ্চলে বাস করে, ওঁরাও নৃগোষ্ঠী উত্তরবঙ্গের রংপুর দিনাজপুর, রাজশাহী অঞ্চলে এবং অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর মানুষ বৃহত্তর পাবর্ত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পটুয়াখালী অঞ্চলে বাস করেন। গবেষকগণ মনে করেন, বড়ুয়া বৌদ্ধরা বৈশালীর বজ্জি বংশীয়; বৌদ্ধদের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সময় তাঁরা পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম এলাকায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। চাকমারা নিজেদের আদি নিবাস চম্পক নগর বলে দাবি করেন। এই চম্পক নগর ভারতের মগধে অবস্থিত ছিল। কুমিল্লা অঞ্চলের বৌদ্ধরা সিংহ পদবি ব্যবহার করেন। তাঁরা মনে করেন বুদ্ধের অপর নাম ছিল শাক্যসিংহ; তাঁরা এ কারণে সিংহ পদবি ব্যবহার করেন।

চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম

বর্তমানে পার্বত্য এলাকাসহ বৃহত্তর চট্টগ্রামে প্রচুর বৌদ্ধ বসবাস করছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার হওয়ার সময়ে চট্টগ্রামেও বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস 'রাজোয়াং' সূত্রে জানা যায় খ্রীষ্টীয় ১৪৬ অব্দে মগধ দেশের চন্দ্র-সূর্য নামে জনৈক সামন্ত যুবক বহুসংখ্যক অনুগামী সৈন্য সামন্ত নিয়ে চট্টগ্রাম ও আরাকান দখল করে একটি অখন্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং আরাকানের ধান্যবতীতে রাজধানী স্থাপন করে চট্টগ্রাম ও আরাকান শাসন করেন। চন্দ্রসূর্যের সৈন্য সামন্ত ছিলেন বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। সংগতভাবে তাঁরা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। চন্দ্রসূর্য বংশের ২৫ জন রাজা ৬২৪ বছর এবং পরে

মহাসিংহ চন্দ্র বংশের রাজারা পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চট্টগ্রাম ও আরাকান শাসন করেন। এ সময়ে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় চট্টগ্রাম ও আরাকানে দ্রুত বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে, বহু বৌদ্ধ বিহার, চৈত্য প্যাগোডা নির্মিত হয়। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে শঙ্খ নদের উত্তরাঞ্চল এবং ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ চট্টগ্রামের নাফ নদীর উত্তর তীর পর্যন্ত মোগল সৈন্যরা দখল করে নেওয়ার ফলে চট্টগ্রামসহ সমগ্র বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যভূক্ত হয়। এ সময়ে প্রতিকূল অবস্থার কারণে বহু রাখাইন বা মারমা সম্প্রদায় বৌদ্ধদের অধ্যুষিত আরাকনে আশ্রয় গ্রহণ করে। বড়ুয়া বৌদ্ধদের অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য হয়। প্রতিকূল পরিবেশে যারা কোনো প্রকারে নিজেদের ধর্ম, কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে জড়িয়ে টিকে ছিল, তারাই বড়ুয়া বৌদ্ধ।

ব্রিটিশ শাসনাধিকারের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ মোগল শাসনামলে চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি আর্থসামাজিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হীনবল হয়ে পড়ে। ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানে ভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতি অনুপ্রবেশ করে। বৌদ্ধদের মধ্যে কিছু হিন্দু ও মুসলিম ধর্মীয় সংস্কৃতির চর্চা করতে দেখা যায়। যেমন: দুর্গাপূজা,সরস্বতী পূজা, মনসাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, শনিপূজা ইত্যাদি সনাতন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি চর্চা এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের ফকির-দরবেশের প্রতি বিশ্বাস, মাজারে মানত, সত্য পিরের শিরনি, বদর পিরের শিরনি, গাজীকালুর গানের আসর ইত্যাদি। বিদ্যমান ভিক্ষুসংঘের মধ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শীলবিপত্তি ঘটে। ফলে বৌদ্ধধর্ম ও বিনয় চর্চায় বহু বৌদ্ধ-বিরুদ্ধ আচার অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ ঘটে। এ অবস্থায় ১৮৫৬ সালের চৈত্র মাসে আরাকানের রাজগুরু সারমেধ মহাস্থবির তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে সীতাকুন্ডে আগমন করেন। সেখানে চট্টগ্রামের তৎকালীন ভিক্ষুদের প্রধান রাধাচরণ মহাস্থবিরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। সাক্ষাতে উভয়ের মধ্যে চট্টগ্রামের বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে রাধাচরণ মহাস্থবির সারমেধ মহাস্থবিরকে চট্টগ্রাম ভ্রমণের আহবান জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সারমেধ মহাস্থবিরের পূর্বপূরুষগণ ছিলেন আরাকানের রাজার বংশধর।

রাধাচরণ মহাস্থবিরের আমন্ত্রণে সারমেধ মহাস্থবির ১৮৫৬ সালে তীর্থদর্শন শেষে সীতকুন্ড ও চক্রশালা ভ্রমণ করে পাহাড়তলী শাক্যমুনি বিহারে প্রায় দুই বছর অবস্থান করেন। এসময়ে তিনি বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করে বৌদ্ধধর্মের নিরিখে ধর্মচর্চা করার জন্য উপদেশ দিতেন। একইসঙ্গে ভিক্ষুসংঘের জীবনযাপনে বিনয়বহির্ভূত নীতি ত্যাগ করে বিনয়ানুকূল জীবন যাপনের উপদেশ দিতে লাগলেন। তাঁর ধর্মদেশনা বাংলা ভাষায় তর্জমা করে দিতেন বাংলা, পালি, সংস্কৃত, উর্দু ও ব্রহ্মভাষায় সুপন্ডিত রাধাচরণ মহাস্থবির।

সারমেধ মহাস্থবির ১৮৬৪ সালে পুনরায় চট্টগ্রামে আসেন। এ সময় জ্ঞানালংকার মহাস্থবির (লালমোহন মহাস্থবির)সহ প্রথমে সাতজন ও পরে আরো অনেকে তাঁর কাছে পুনঃদীক্ষা গ্রহণ করেন। সারমেধ মহাস্থবিরের কাছে যাঁরা পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা সংঘরাজ নিকায় এবং যাঁরা উপসম্পদা গ্রহণ করেননি, তাঁরা 'মহাস্থবির নিকায়' নামে পরিচিতি লাভ করেন। এভাবে চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশে দুটি নিকায়ের সৃষ্টি হয়, যা এখনও আছে।

বাংলাদেশ তথা চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের নবজাগরণের সূচনা হয় ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে। এ সময় ধর্ম সংস্কারে সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের অবদান, বাংলাদেশের বৌদ্ধদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ১৮৮৭ সালে গুণামেজু মহাস্থবির, নাজির কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী, ডা. ভগীরথ চন্দ্র বড়ুয়ার নেতৃত্বে 'চট্টল বৌদ্ধ সমিতি' (বর্তমানে বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি) প্রতিষ্ঠা, ১৮৯২ সালে কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির কলকাতায় বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা (Bengal Buddhist Association) গঠন করেন এবং মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের কর্তৃক ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ (বর্তমানে বাংলাদেশ বৌদ্ধকৃষ্টি প্রচার সংঘ) প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তীতে সময়ে বাংলাদেশ

বুড্ডিস্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফাউন্ডেশন, প্রান্তিক ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইত্যাদি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়; যেগুলো বাংলাদেশের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে নিঃসন্দেহে অবদান রেখে চলেছে।

বাংলাদেশের সামাজিক অগ্রগতি ও রাজনৈতিক সংগ্রামে বৌদ্ধদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্য আন্দোলনে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর অনেকে অংশগ্রহণ করে জেল খেটেছেন, নির্যাতিত হয়েছেন এমনকি ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও বাংলাদেশি বৌদ্ধদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। অবস্থানগত ও সংখ্যাগত কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৌদ্ধদের বিচরণক্ষেত্র সীমিত পরিসরে হলেও আনুপাতিক হারে তাদের অবদান কোনো অংশেই কম নয়; বরঞ্চ এ বিষয়ে তাঁদের আত্মত্যাগ অত্যন্ত গৌরবের ও আত্মশ্লাঘার। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বৌদ্ধরা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন, অনেকে শহিদ হয়েছেন, অনেকে নিখোঁজ হয়েছেন; লুণ্ঠিত হয়েছে বৌদ্ধদের ধন সম্পদ, অগ্নিদগ্ধ হয়েছে হাজার হাজার বৌদ্ধ ঘরবাড়ি, লাঞ্ছিত ও ধর্ষিত হয়েছে, অনেক বৌদ্ধ তরুণ-তরুণী। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার আলবদর বাহিনীর কবল থেকে সংসারত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষু, বৌদ্ধ উপাসনালয় ও মূল্যবান বুদ্ধমূর্তি লুণ্ঠিত হয়েছে। এ সময়ে বহু বৌদ্ধ নর-নারী পরিবার-পরিজন নিয়ে ভারত ও মিয়ানমারে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় প্রতিটি বৌদ্ধ গ্রাম ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র ও আশ্রয়কেন্দ্র। বাংলাদেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশাপাশি চাকমা, মারমা, বড়ুয়া, রাখাইন, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক, খিয়াং প্রভৃতি বৌদ্ধ নৃগোষ্ঠীর বসবাস। আর বড়ুয়া বৌদ্ধরা প্রধানত বৃহত্তর চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী ইত্যাদি সমতল অঞ্চলে বসবাস করেন। বাংলদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক বিকাশ সাধনে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের পাশাপাশি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

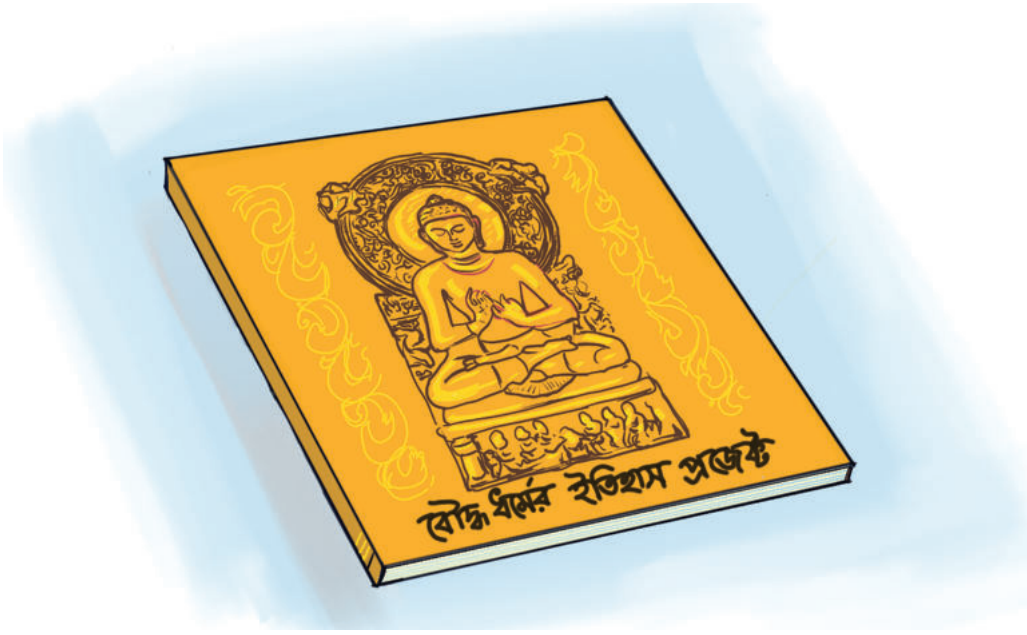

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৫

ইতিহাসের টাইমলাইন তৈরির অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে তোমার লিখিত মতামত দাও
কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)?
কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)?
সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?

ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)?

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

ফিরে দেখা: নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে এবং না হলে না এর ঘরে (✓) চিহ্ন দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না

বৌদ্ধধর্মে সহমর্মিতা

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা জানতে পারব—

- বৌদ্ধধর্মের মৌলিক শিক্ষা;
- বৌদ্ধধর্মে উন্নত জীবন গঠনে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার গুরুত্ব;
- বৌদ্ধধর্মে সাম্যবাদ;
- বৌদ্ধধর্মে মানবিক মর্যাদা।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৬

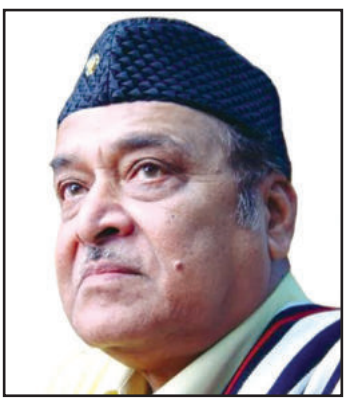

প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী ভূপেন হাজারিকার 'মানুষ মানুষের জন্য' গানটি অনেকে শুনে থাকবে। চলো সবাই মিলে গানটি গাই।

গান: মানুষ মানুষের জন্যে
শিল্পী: ভূপেন হাজারিকা
কথা ও সুর: ভূপেন হাজারিকা

মানুষ মানুষের জন্যে

জীবন জীবনের জন্যে

একটু সহানুভূতি কি

মানুষ পেতে পারে না?

ও বন্ধু...

মানুষ মানুষকে পণ্য করে

মানুষ মানুষকে জীবিকা করে,

পুরনো ইতিহাস ফিরে এলে

লজ্জা কি তুমি পাবে না?

ও বন্ধু...

বল কি তোমার ক্ষতি?

জীবনের অথৈ নদী

পার হয় তোমাকে ধরে

দুর্বল মানুষ যদি।

মানুষ যদি সে না হয় মানুষ

দানব কখনো হয় না মানুষ,

যদি দানব কখনো বা হয় মানুষ

লজ্জা কি তুমি পাবে না?

ও বন্ধু... মানুষ মানুষের জন্যে।

নিচে গানটির লিংক ও কিউ আর কোড পেয়ে যাবে।

https://www.youtube.com/watch?v=YStr0I6-GII

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৭

গানটির সারমর্ম লিখি

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

বৌদ্ধধর্মের মৌলিক শিক্ষা

গৌতম বুদ্ধ জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সব প্রাণী ও মানুষের কল্যাণে তাঁর ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর শিক্ষার মূল বাণী হলো মৈত্রী, করুণা, শান্তি ও সম্প্রীতি। তিনি কেবল মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করেননি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব সত্তার মঙ্গলের জন্য চিন্তা করেছিলেন। সব সত্তার প্রতি তিনি মৈত্রীভাব পোষণ করতে বলেছেন। তাঁর মৈত্রী করুণা অসীম, কোনো সাম্প্রদায়িক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ নয়। মহাকারুণিক গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা সর্বজনীনভাবে আড়াই হাজার বছরের বেশি সময় ধরে সারা বিশ্বে শান্তি, মানবতা ও আধ্যাত্মিকতা বিকাশের ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বৌদ্ধধর্মের এ সর্বজনীন অবদানকে স্মরণ করে ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ গৌতম বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্বলাভ, পরিনির্বাণ লাভ— এ ত্রিস্মৃতি বিজড়িত দিবসকে 'বৈশাখ দিবস' (Vesak Day) হিসেবে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কারণ, বুদ্ধের শিক্ষা জাতিসংঘ সনদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। বর্তমান সংঘাতময় বিশ্বে গৌতম বুদ্ধের সহনশীলতা, সম্প্রীতি, শান্তি ও করুণার সর্বজনীন বার্তা খুবই প্রাসঙ্গিক।

বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি ভারতবর্ষে। কিন্তু এটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন: শ্রীলংকা, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, তিব্বত, চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, নেপাল, বাংলাদেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কিছু অংশে বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করা হয়। বর্তমান বিশ্বে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন মানুষ বৌদ্ধধর্মের অনুসারী।

বুদ্ধ মানবজীবনের সমস্যাবলি নিয়ে চিন্তা করেছেন, সমাধানের উপায়ও বলে দিয়েছেন। বুদ্ধের শিক্ষামতে, নৈতিক জীবন গঠন করে সুখী জীবন যাপন করা এবং অন্তিমে নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করে নির্বাণ অর্জনের

মাধ্যমে চরম দুঃখের অবসান করা সম্ভব। ইহজীবনে সুখী জীবন ও অন্তিমে পরম সুখ নির্বাণ অর্জন করার এ প্রক্রিয়ায় তিনি তিনটি অনুশীলনের শিক্ষা দিয়েছেন। যথা— শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা।

শীল হলো নৈতিকতার অনুশীলন। পুণ্য অর্জন ও ভালো আচরণ করা এবং নৈতিকতার শিক্ষা গ্রহণ করা। এ শিক্ষা দুটো মূল নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত: সমতা— সকল জীব সমান; এবং পারস্পরিকতা— নিজে অন্যের কাছ থেকে যেমন আচরণ প্রত্যাশা করি, সবার সঙ্গে তেমনি আচরণ করা। কারোর কাছে ভালো আচরণ প্রত্যাশা করলে, নিজেকেও তার সঙ্গে ভালো আচরণ করতে হবে।

সমাধি হলো মনের অনুশীলন। এর অর্থ হলো একাগ্রতা, ধ্যান ও মনের উৎকর্ষ সাধন। মনের উন্নতি সাধিত হলে প্রজ্ঞা হয় এবং প্রজ্ঞা উৎপন্ন হলে বিমুক্তির পথ সুগম হয়। মানসিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এর ফলে আচরণ বা শীল পরিশীলিত হয়।

প্রজ্ঞা হলো দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দর্শন, অর্থাৎ মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করা। প্রজ্ঞা হলো বৌদ্ধধর্মের সার অংশ। দেহ ও মন পূত-পবিত্র ও প্রশান্ত হলে প্রজ্ঞার উৎপত্তি হয়।

বুদ্ধের শিক্ষামতে, এ তিনটি অনুশীলনের মধ্যে প্রজ্ঞা অনুশীলনকে সবচেয়ে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞা অনুশীলনের মাধ্যমে জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষ প্রকৃত সুখ লাভ করতে পারে। এটা সর্বজনীন শিক্ষা।

বুদ্ধের শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মুক্তচিন্তা। তিনি তাঁর ধর্মকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করার পরামর্শ দিয়েছেন। উপদেশ দিয়েছেন ভালো-মন্দ যাচাই করে তাঁর শিক্ষা গ্রহণের। পরস্পরের প্রতি মৈত্রী-করুণা পোষণ করা এবং প্রতিনিয়ত আত্ম-উন্নতি করার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'নিজের মুক্তি নিজেকেই অর্জন করতে হবে, আমি শুধু পথ দেখাতে পারি।' বুদ্ধের শিক্ষার তিনটি মৌলিক অঙ্গ হলো:

১. তিনটি সর্বজনীন সত্য;

২. চতুরার্য সত্য;

৩. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

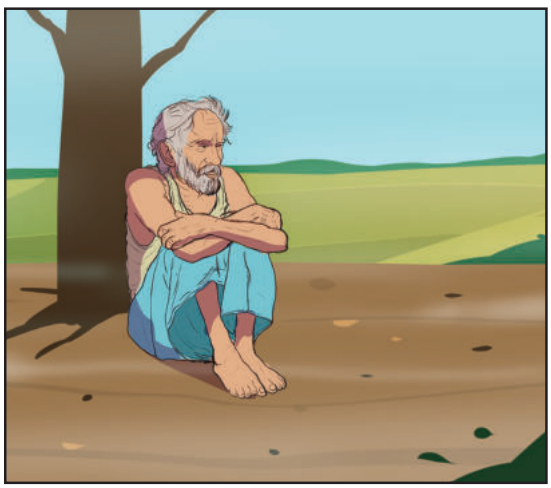

শীতার্ত ব্যক্তি

ক্ষুধার্ত শিশু

তিনটি সর্বজনীন সত্য

১. পৃথিবীতে কোনো কিছু স্থায়ী নয়, প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল;

২. যা পরিবর্তনশীল বা অনিত্য, তা দুঃখের জন্ম দেয়;

৩. অনাত্মা অর্থাৎ আত্মা বলতে কিছু নেই।

চতুরার্য সত্য:

দুঃখের কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে বুদ্ধ চতুরার্য সত্য আবিষ্কার করেছেন। চারটি সত্য হলো—

১. দুঃখ সত্য: জগতে দুঃখ আছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবাই দুঃখের অধীন। জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ, কাঙ্ক্ষিত জিনিসের অপ্রাপ্তি দুঃখ এবং পঞ্চস্কন্ধময় এ দেহ দুঃখ হতে পৃথিবীতে কেউ মুক্ত নয়। জন্মজন্মান্তরে সব জীব এসব দুঃখ ভোগ করে আসছে;

২. দুঃখের মূল কারণ হলো কামনা বা তৃষ্ণা। তিন ধরনের তৃষ্ণা দুঃখ তৈরি করে। যেমন: কাম তৃষ্ণা (যেমন: অতি ভোগ স্পৃহা); ভব তৃষ্ণা (যেমন: নাম, যশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি পাওয়ার ইচ্ছা) এবং বিভব তৃষ্ণা (যেমন: জীবনে অপ্রীতিকর কোনো কিছুর মুখোমুখি না হওয়ার আকাঙ্ক্ষা; যেমন: বিপদ থেকে মুক্ত থাকার ইচ্ছা);

৩. দুঃখের নিরোধ আছে। কামনা বা তৃষ্ণা নিবৃত্তির মাধ্যমে চরম দুঃখমুক্তি নির্বাণলাভ সম্ভব হয়;

৪. দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথও আছে। এ দুঃখমুক্তির পথ হলো আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। মার্গ মানে পথ। দুঃখমুক্তির পথ হিসেবে বুদ্ধ আটটি পথ বা নিয়মা অনুসরণ করার নির্দেশনা দিয়েছেন।

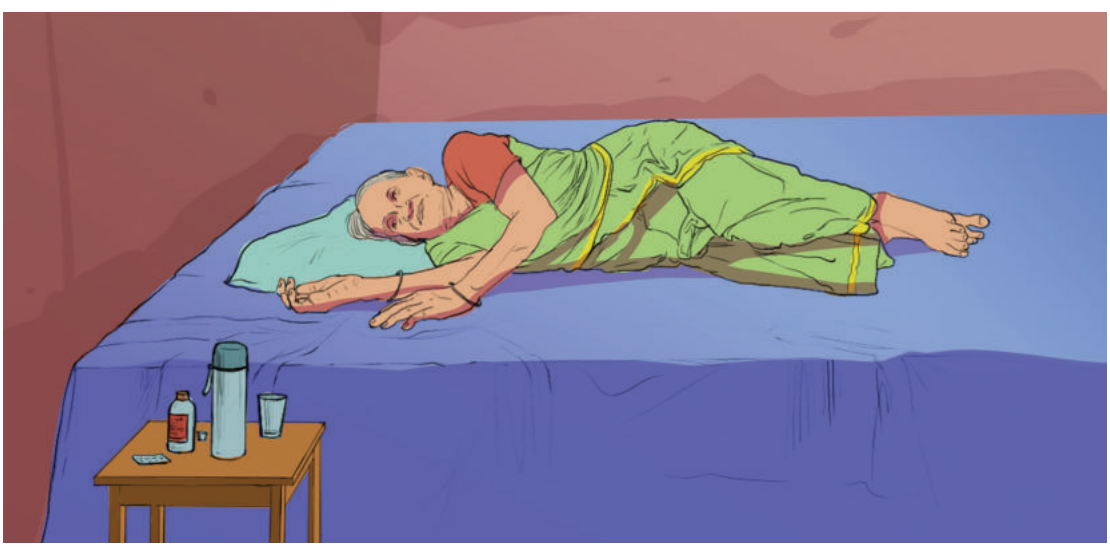

অসুস্থ নারী

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

মানুষ জন্মজন্মান্তরে বিভিন্ন কামনা-বাসনার কারণে দুঃখ ভোগ করে। বুদ্ধ এসব দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের জন্য খুব সহজভাবে আটটি পথ অনুসরণ করার উপদেশ দিয়েছেন। সেগুলো হলো ১. সৎ বাক্য, ২. সৎ কর্ম, ৩. সৎ জীবন বা জীবিকা, ৪. সৎ চেষ্টা, ৫. সৎ চিন্তা, ৬. সৎ চেতনা, ৭. সৎ সংকল্প ও ৮. সৎ দৃষ্টি বা সমাধি।

উল্লেখিত প্রথম তিনটি পথ অনুসরণ করে মানুষ তার দেহকে রক্ষা করে। সৎ চেষ্টা, সৎ চিন্তা ও সৎ চেতনার মাধ্যমে মানুষ তার মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সৎ সংকল্প ও সৎ দৃষ্টি বা সমাধির মাধ্যমে প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। এর ফলে দুঃখমুক্তি লাভ সহজ হয়।

পাঁচটি শিক্ষানীতি

বুদ্ধ সকল মানুষের পরম সুখ লাভের উপায় হিসেবে সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন প্রজ্ঞার ওপর। সেটি অনুশীলন করতে কঠোর ত্যাগ ও সাধনার প্রয়োজন। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের পক্ষে এটা করা সহজ; কিন্তু সাধারণ গৃহীদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হতে পারে। সে কারণে বুদ্ধ উপদেশ দিয়েছেন, কেবল পাঁচটি নীতি (যা পঞ্চশীল হিসেবে পরিচিত) অনুসরণ করলেও ইহজীবনে ব্যক্তি জীবন ও সমাজ-জীবন সুখের হয়। সে পাঁচটি নীতি বা শিক্ষা হলো—

১. কাউকে হত্যা করা বা ক্ষতি করা বা জীবিত প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ থেকে বিরত থাকা। একই সঙ্গে নিজের জীবনে মৈত্রী ও করুণা চর্চা করা;

২. চুরি না করা। সবার সঙ্গে পারস্পরিক সততা ও শ্রদ্ধাবোধ অনুশীলন করা এবং অন্যের সহায়-সম্পত্তির মালিকানা ও অধিকারের প্রতি সম্মান করা এবং সততা অনুশীলন করা;

৩. ব্যভিচার না করা বা নর-নারীদের মধ্যে অসদাচারণ না করা; জীবনে সম্মান, আন্তরিকতা ও সততার অনুশীলন করা;

৪. মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকা; জীবনে সত্যবাদিতা অনুশীলন করা; এবং

৫. ক্ষতিকর পানীয় ও মাদকাসক্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখা; ভাবনা বা ধ্যানের মাধ্যমে জীবনে মননশীলতা চর্চা ও সচেতনতা তৈরি করা।

কেবল এ পাঁচটি নীতি অনুসরণ করেও নিজেকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা যায়। এতে ব্যক্তিজীবন যেমন উন্নত হয়, তেমনি সমাজেরও অনেক উন্নতি হয়। সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি ও সুসম্পর্ক তৈরি হয়। এ পাঁচটি নীতির উপকারিতা সম্পর্কে বুদ্ধ বলেছেন, "অভযং দেতি, অবেরং দেতি, অব্যাপজ্জং দেতি"। অর্থাৎ পঞ্চশীল পালনের মাধ্যমে সমাজের মানুষ ভয়, হিংসা এবং মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকে। যেমন: হত্যা ও মাদকাসক্তি থেকে দূরে থাকলে সমাজে সহিংসতা থাকে না; অন্যের জিনিস চুরি না করলে সমাজের মানুষের সম্পত্তির সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়; ব্যাভিচার না থাকলে পারিবারিক মূল্যবোধ ও শান্তি সুদৃঢ় হয়। সমাজের মানুষ মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকলে সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ভালো হয়, তাদের মধ্যে আস্থা ও সুসম্পর্ক তৈরি হয়। সামাজিক পরিবেশ উন্নত হয়। বুদ্ধের শিক্ষামতে, কেবল এ পাঁচটি নীতি অনুসরণ করলেও যেকোনো সমাজে সুখ, শান্তি, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব।

বৌদ্ধধর্মে উন্নত জীবন গঠনে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার গুরুত্ব

মানুষের জীবনে সুষ্ঠু ও সার্থক জীবন গড়ে তোলার জন্য বুদ্ধ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা গুণের কথা বলেছেন। এ চারটি গুণকে একত্রে ব্রহ্মবিহার বলা হয়। ব্রহ্ম ও বিহার দুটি শব্দ মিলে ব্রহ্মবিহার শব্দটি গঠিত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে 'ব্রহ্ম' হলো শ্রেষ্ঠ দেবসত্তা, যিনি ধ্যান সাধনার মাধ্যমে পরিপূর্ণতা অর্জন করে ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন; আর 'বিহার' অর্থ 'আবাস'। বৌদ্ধধর্মমতে, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা— এ চার ব্রহ্মবিহার নীতি চর্চা করে এমন অপরিমেয় পরিশুদ্ধতা অর্জন করা যায়, যা যেকোনো মানুষকে মহত্তম ও দেবতুল্য করে তোলে; অর্থাৎ ব্রহ্মার মতো হন। ব্রহ্মবিহারী মানুষের মধ্যে সব সময় সকল জীবের প্রতি দয়া ও বিপদগ্রস্তদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে সক্রিয় প্রচেষ্টা থাকে; তিনি অন্যের সুখে সুখী হন এবং তিনি লাভ-অলাভ, নিন্দা-প্রশংসা, সাফল্য-ব্যর্থতা ও সুখ-দুঃখের মধ্যেও মানসিকভাবে স্থির থাকেন। এজন্য ব্যক্তিজীবনে পরিশুদ্ধতা অর্জন করতে এবং সমাজে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ব্রহ্মবিহার নীতির গুরুত্ব অনেক। এগুলো ব্যক্তি জীবনের আধ্যাত্মিকতা অর্জনের ভিত্তি, তেমনি সমাজের মানুষের মাধ্যমে পারস্পরিক সদ্ভাব ও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠারও ভিত্তি।

১. মৈত্রী

মেত্তার বাংলা সমার্থক শব্দ মৈত্রী। মৈত্রী শব্দের অনেক অর্থ আছে। যেমন: সর্বজনীন প্রেম, দয়া, বন্ধুতা, শুভকামনা, উপকারিতা, সহভাগিতা, সৌহার্দ্য, মিলন, অনাক্রম ও অহিংসা। মৈত্রীর মূল অর্থ হলো, সবার জন্য কল্যাণ ও সুখ কামনা (পালিতে পরহিত-পরসুখ কামনা)। কারোর মনে যখন মৈত্রী জন্মে, তখন সে কখনো কাউকে ক্ষতি করতে পারে না, কারোর বিরুদ্ধে ক্ষোভ বা রাগ থাকে না। মৈত্রীর মাধ্যমে অসীম প্রেম, সহমর্মিতা, সহভাগিতা, বন্ধুতা তৈরি হয় বলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সামাজিক, ধর্মীয়, জাতিগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাধা সমাধান করা সম্ভব হয়। সে কারণে মৈত্রী হলো নিঃস্বার্থ ও সর্বজনীন ভালোবাসা।

বুদ্ধ বলেছেন, মা যেমন একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করেন, তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করতো। নিদ্রার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত দাঁড়ানো অবস্থায়, চলমান অবস্থায়, বসা বা শোয়া অবস্থায় মৈত্রী চিন্তা করতে হবে। অর্থাৎ সব সময় মৈত্রীভাব বজায় রাখতে হবে। এ মৈত্রী শুধু মানুষের প্রতি নয়, সকল জীবের প্রতি পোষণ করতে হবে। ছোট-বড়, দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান, যারা জন্মেছে বা ভবিষ্যতে জন্মাবে, সকল জীবের প্রতি মঙ্গল কামনা করতে বুদ্ধ উপদেশ দিয়েছেন। মানুষ পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। আপদে-বিপদে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে হয়। সে কারণে শুধু পারিবারিক বন্ধন নয়, সমাজের সব মানুষের মধ্যে বন্ধন সুদৃঢ় হতে হবে। কারো মনে যদি হিংসা-বিদ্বেষ থাকে, ঝগড়াটে হয়, তাহলে সে বিপদের সময় কারো সহযোগিতা পাবে না। সে কারণে বুদ্ধ রাগ, ঘৃণা, বিদ্বেষ দূর করে সবার প্রতি মৈত্রীভাব গড়ে তুলতে উপদেশ দিয়েছেন। মৈত্রীভাবে দুই ভাগে গড়ে তোলা যায়: ১. কুশল কর্ম চর্চার মাধ্যমে। যেমন: কারো সঙ্গে খারাপ কথা না বলা, সবার সঙ্গে বন্ধুত্বভাব বজায় রাখা ইত্যাদি; ২. মৈত্রী ভাবনার মাধ্যমে। সবার সুখ কামনা করা। মৈত্রী ভাবনার মাধ্যমে মানুষের চিত্ত শান্ত ও সমাহিত হয়; কায়িক আচরণ, বাক্য ও মন সংযত হয়। এতে শত্রুভাব দূর হয়। কোনো নিন্দনীয় কাজ না করা, অল্প লাভে সন্তুষ্ট থাকা এবং বিদ্বেষ বা রাগবশত কারো দুঃখ কামনা না করা। এভাবে মৈত্রী ভাবনাকারী ব্যক্তির তৃষ্ণা নিরোধ হয় এবং অন্তিমে পুনর্জন্ম রোধ করে নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হন।

২. করুণা

করুণা অর্থ হলো করুণা ভাবনার দ্বারা মানুষ ও সব সত্তার প্রতি নিঃস্বার্থভাবে দয়া পোষণ করা এবং তাদের দুঃখ নিরসনের জন্য চিন্তা করা, তাদের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত করার জন্য সংকল্প করা। করুণা একটি সক্রিয় কাজ, যেমন: ক) কোনো ব্যক্তি যদি কোনো দুর্দশার মধ্যে থাকে, তাকে দেখে কারো যদি দয়া উদয় হয়, তাহলে তিনি সক্রিয়ভাবে ঐ ব্যক্তির দুর্দশা দূর করার জন্য সাহায্য করেন; খ) কারো মনে যখন করুণা তৈরি হয়, তখন তিনি অন্য কারো দুঃখ সহ্য করতে পারেন না; তিনি তাকে সাহায্য করেন; ও গ) কারো ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা হলো করুণার বহিঃপ্রকাশ এবং কাউকে ক্ষতি না করার চিন্তা ও শান্তি করুণা অনুশীলনের মাধ্যমে আসে। ভাবনার মাধ্যমে করুণা তৈরি হয়।

করুণার ধারণাকে একটি উপমার মাধ্যমে সহজভাবে বুঝানো যায়। যেমন: অনেক আগের কথা। এক ব্যক্তি একাকী এক দূর গ্রামে যাওয়ার জন্য বের হলেন। যাত্রার মধ্যপথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, একপর্যায়ে তাঁর চলার শক্তি শেষ হয়ে এলো। তিনি খুবই কষ্টবোধ করছিলেন। কিন্তু তাঁর গন্তব্য গ্রাম আরো অনেক দূরে। সে সময় সেখানে এক লোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি ঐ অসুস্থ পথচারীকে দেখতে পেলেন। অসুস্থ পথচারীকে দেখে তিনি মনে মনে ভাবলেন, যদি তাঁকে সেবা দেওয়া যায়, বন থেকে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া যায়, তাঁকে ওষুধ ও ভালো পথ্য খাওয়ানো যায়, তাহলে তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে পারবেন।

এ উপমায় দ্বিতীয় ব্যক্তির করুণার পরিচয় পাওয়া যায়। অসুস্থ পথচারীর প্রতি তাঁর মনে করুণা, সমব্যথা ও দয়া উৎপন্ন হয়েছে। এভাবে অন্যের দুঃখ-দুর্দশা দূর করাই হলো করুণা।

৩. মুদিতা

এ ভাবনার মাধ্যমে ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা ত্যাগ করে অন্যের সুখ ও সাফল্যে সুখ অনুভব করা। যেমন: কোনো শিক্ষার্থী যদি খুব পরিশ্রম করে ভালো ফল অর্জন করে এবং পুরস্কার লাভ করে, তার সাফল্যে খুশি হওয়া। সে ভবিষ্যতে যাতে আরো উন্নতি করতে পারে, তাকে উৎসাহ দেওয়া ও সহযোগিতা করা।

কেউ কেউ অন্যের সাফল্যে ঈর্ষা পোষণ করে। অন্যের সফলতা কামনা করতে পারে না। মনের মধ্যে এক কুচিন্তা তৈরি করে। এ রকম কুচিন্তা থেকে তারা অন্যের দুঃখ-দুর্দশা সৃষ্টি করে। এরকম ঈর্ষার বিপরীত অবস্থা হলো মুদিতা। যাঁর মধ্যে মুদিতা জন্মে, তিনি কখনো কারো প্রতি ঈর্ষা করেন না, অন্য কেউ সাফল্য অর্জন করলে খুশি হন। অন্য কেউ ধন সম্পদ অর্জন, কোনো কাজে ভালো ফল ও নাম-যশ অর্জন করলে তিনি প্রশংসা করেন। এভাবে মুদিতা সমাজে ভালো কাজ করা; জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ইত্যাদিকে উৎসাহিত করে। মুদিতা অনুশীলন বিভিন্নভাবে করা যায়। যেমন: ক) অন্যের সফলতায় আনন্দ উদ্‌যাপন করা; খ) অন্যের সাফল্যে মনের মধ্যে হিংসা না আনা; ও গ) মনের ভেতর থেকে বিদ্বেষভাব দূর করা।

৪. উপেক্ষা

রাগ, ভয়, মোহ ও পক্ষপাতমুক্ত হয়ে সবকিছুতে নিরাসক্ত হয়ে সমদৃষ্টিতে দেখাই হলো উপেক্ষা ভাবনা। আমরা যদি চারদিকে দেখি এবং নিজের ভেতরকে দেখি, তখন বুঝা যায় নিজের মনের মধ্যে সমতা বজায় রাখা কতটা কঠিন। মানুষের জীবনে অনেক উত্থান-পতন থাকে, সাফল্য ব্যর্থতা থাকে। রাত-দিনের মতো মানুষের জীবনে নানা বৈপরীত্য থাকে। যেমন: সুখ-দুঃখ, সাফল্য-ব্যর্থতা, লাভ-অলাভ, নিন্দা-প্রশংসা ইত্যাদি মানুষের

জীবনের অংশ। এসব লোকধর্মে মানুষ সহজে উদ্বেলিত কিংবা বিচলিত হয়। যখন ভালো কিছু হয়, তখন সে খুশিতে খুবই উল্লসিত হয়; আর যখন দুঃখ আসে, তখন খুবই বিচলিত হয়। আশা, হতাশা মানুষের খুবই সাধারণ ব্যাপার। এসব হলো আবেগ। মানুষ আবেগে নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মনের শান্তি হারিয়ে ফেলতে পারে। এমনকি মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলতে পারে। এ অবস্থায় আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং তা সুচিন্তিতভাবে। এজন্য নিজের মনের ওপর সজাগ দৃষ্টি রেখে সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, নিন্দা-প্রশংসা অর্থাৎ জীবনের নানা উত্থান-পতনের মধ্যে নিজেকে স্থির রাখা জরুরি। এটাই হলো উপেক্ষা।

৩. বৌদ্ধধর্মে সাম্যবাদ

বুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মধ্যে ভেদাভেদ ছিল। বুদ্ধ জাতিভেদ, ধর্ম ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শুদ্র, চণ্ডাল সবাই মানুষ। মানুষ হিসেবে সবাই সমান। জাতি বা বর্ণভিত্তিক পরিচিতি মানুষের প্রকৃত পরিচয় হতে পারে না, সেটি মানুষের পরিচিতির সাধারণ একটা নাম মাত্র। পেশাভিত্তিক সাধারণ পরিচিতি থাকতে পারে। যেমন: তৎকালীন ভারতবর্ষে পেশা অনুসারে চতুর্বর্ণ প্রথা ছিল: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণের কাজ হলো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদি করা, ক্ষত্রিয়ের কাজ হলো দেশ রক্ষা করা, বৈশ্যের কাজ হলো কৃষিকাজ ও ব্যবসা করা এবং শূদ্রের কাজ হলো অন্যদের সেবা করা। তখনকার সময়ে শূদ্রদের সবচেয়ে নীচ জাতের মনে করা হতো। তারা অস্পৃশ্য ছিল। তাদেরকে বিভিন্নভাবে হেয় করা হতো। রাজা-প্রজা, ধনী-গরিব, উঁচু-নীচ এমন কোনো ভেদাভেদ বুদ্ধ মানেননি। বুদ্ধ রাজা শ্রেষ্ঠীদের আমন্ত্রণ যেমন গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি সে সময়ের সমাজের তথাকথিত অস্পৃশ্য মানুষের বাড়িতে গিয়েও অন্ন গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সর্বশেষ আহার গ্রহণ করেছিলেন কর্মকার চুন্দর বাড়িতে। জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে তিনি সবাইকে স্থান দিয়েছিলেন। বৌদ্ধ ইতিহাসে আম্রপালী নামে এক গণিকার কথা আছে। তিনি সমাজের চোখে ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য ছিলেন। ধনাঢ্য ব্যক্তি ও সমাজপতিদের আপত্তি সত্ত্বেও বুদ্ধ অস্পৃশ্য আম্রপালীর বাড়ি গিয়ে আহার গ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধ উপদেশ দিয়েছিলেন, পাপীকে নয়, পাপকে ঘৃণা করো; মানুষ মানুষ হয়ে জন্মায়, পাপী হয়ে নয়। সমাজ ও পরিস্থিতি তাকে খারাপ বানায়। বুদ্ধ সারা জীবন মানুষকে ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে সৎ, সুখী ও শান্তিপূর্ণ জীবন শিক্ষা দিয়েছিলেন। বুদ্ধ কখনো অন্য ধর্মকে কিংবা অন্য ধর্মের লোককে অবজ্ঞা করেননি। তাঁর শিষ্যদের কখনো তাঁর ধর্মে ধর্মান্তরিত করার অনুমতি দেননি। তাঁর শিক্ষার একটাই উদ্দেশ্য— জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সব মানুষকে ন্যায়নিষ্ঠ, মহান ও ধর্মসম্মত জীবনব্যবস্থায় গড়ে তোলা।

গৌতম বুদ্ধের সাম্যবাদ ও মানবতাবাদের আদর্শে অনেক মহান ব্যক্তি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম। তিনি তাঁর বিভিন্ন নাটক ও কবিতায় বুদ্ধের মানবতাবাদ ও সাম্যবাদের লড়াইকে সমর্থন করেছিলেন। কবি গুরুর এমন একটি নাটক 'চণ্ডালিকা'। এ নাটকে তিনি জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বুদ্ধের অবস্থানকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছিলেন। বুদ্ধের শিষ্য আনন্দ এক অস্পৃশ্য চণ্ডালকন্যার কাছে পিপাসার্ত হয়ে জল চেয়েছিলেন। তখন চণ্ডালকন্যা বিব্রত হয়ে ভিক্ষু আনন্দকে জল দিতে চায়নি। কারণ, সে নিজেকে অস্পৃশ্য মনে করে। অস্পৃশ্য কারোর কাছ থেকে জলপান পাপ হবে। তখন চণ্ডালিকা ভিক্ষু আনন্দকে বলছিল, 'প্রভু, আমি চণ্ডালের মেয়ে, কুয়োর জল অশুদ্ধ।' এর উত্তরে আনন্দ চণ্ডালিকাকে বললেন, 'কে বলে তুমি অস্পৃশ্য?' তাকে আরো বললেন 'যে মানুষ আমি, তুমিও সেই মানুষ, সব জলই তীর্থজল, যা তাপিতকে স্নিগ্ধ করে, তৃপ্ত করে তৃষিতকে।' চণ্ডালিকা এরকম কথা কারোর কাছ থেকে কখনো শোনেনি। আনন্দের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে সে তাঁকে তেষ্টা নিবারণের জন্য পানি পান করতে দিয়েছিল। এ কাহিনির মাধ্যমেও মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই— সে সত্যই তুলে ধরা হয়েছে।

৪. বৌদ্ধধর্মে মানবিক মর্যাদা

বৌদ্ধধর্ম অনুসারে, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা নয়; বরং অন্যের সেবা করে তাদের দুঃখ লাঘব করাই মহৎ কাজ। এ মহৎ কাজের জন্য মানুষকে অনেক মানবিক গুণ অর্জন করতে হয়। এ মানবিক গুণাবলি নীতি-নৈতিকতা, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক রীতি-নীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। মানবিক গুণাবলির মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনে মানুষ একে অপরের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। মানুষ প্রাণী, পশুও প্রাণী। পশুর সঙ্গে মানুষের একটা পার্থক্য হলো, মানুষের মন আছে, যেটা পশুর নেই। মন আছে বলে মানুষ চিন্তা করতে পারে; কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে, যেটা পশু পারে না। পশু সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়, কিন্তু মানুষ নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তার আচরণ সংযত করতে পারে। মানুষ তার মনের শক্তিকে উন্নত করতে পারে, নিজেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। সে বুদ্ধত্বলাভের সক্ষমতাও রাখে।

নৈতিক লজ্জা ও নৈতিক ভয়

বৌদ্ধধর্মমতে, মানুষ দুটি বিষয় দ্বারা চালিত হয়। যথা- নৈতিক লজ্জা ও নৈতিক ভয়। পালিতে এটাকে বলে হিরি ও অত্তপা। হিরি-অত্তপা মানুষের মানবিক মর্যাদাকে সমুন্নত রাখে। হিরি অর্থ হলো যেকোনো অকুশল কাজ করতে মনে মনে লজ্জা বোধ করা; আর অত্তপা হলো অকুশল কাজ করলে দুঃখ ভোগ করতে হবে, সেই ভয়ে অকুশল কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। হিরি ও অত্তপা না থাকলে মানুষ পশুতে পরিণত হয়। এ দুটি জিনিস না থাকলে মানুষ মাদকাসক্তি, নেশা, লোভ-লালসা, ক্রোধ, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, ঘৃণা ইত্যাদি খারাপ কাজে জড়িত হয়ে সে পশুর মতো আচরণ করতে পারে। আর যার মধ্যে নৈতিক লজ্জা ও নৈতিক ভয় সব সময় কাজ করে, সে কখনো খারাপ কাজ করতে পারে না। তার মধ্যে অন্যের প্রতি মৈত্রী, করুণা, সহমর্মিতা গড়ে ওঠে, সে অন্যের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। সে সব সময় অন্যের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। সে কারণে মানুষ হিসেবে আমাদের মানবিক গুণাবলি অর্জন করতে হবে। অন্যের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে আমাদের পরস্পরকে জানা, দয়া, করুণা, সততা, সরলতা, ভদ্রতা, নম্রতা ও সন্তুষ্টিবোধ এসব মানবিক মূল্যবোধ অর্জন করতে হবে।

মানুষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য

স্বভাবগতভাবে মানুষের তিনটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। যথা- পশুস্বভাব, মনুষ্যস্বভাব ও দেবস্বভাব। এ স্বভাবগুলো প্রত্যেক মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে। যার মধ্যে পশুস্বভাব বেশি কাজ করে, সে তার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সে পশুর মতো জঘন্য আচরণ করতেও লজ্জাবোধ করে না। তখন সে সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এ পশুস্বভাব দমনের জন্য ধর্মের অনুশাসন ও অনুশীলন অপরিহার্য। গৌতম বুদ্ধ মানুষকে এ পশুস্বভাব থেকে মুক্ত হতে শীল পালনের উপদেশ দিয়েছেন। গৌতম বুদ্ধের শিক্ষাগুলো ভিক্ষুসংঘ সাধারণ মানুষের কল্যাণে প্রচার করে যাচ্ছেন। গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা ও পন্ডিত ভিক্ষুসংঘের দেশিত শিক্ষা অনুসরণ করলে প্রত্যেক মানুষ মানবিক গুণাবলি অর্জন করতে পারবে। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে মানুষ তার মনকে চর্চা ও পরিচর্যা করে তার ভেতরের মনুষ্য স্বভাবকে জাগ্রত করতে পারে। সে যতই তার মনুষ্য স্বভাবকে চর্চা ও পরিচর্যা করতে পারবে, সে ততই তার ভেতরের দেবস্বভাব অর্জন করতে পারবে। কেউ যদি তার দেবস্বভাব অর্জন করতে পারে, তাহলে সে যখন এমন একটা উচ্চপর্যায়ে আসীন হবে, তখন তার মন থেকে লোভ-লালসা, ক্রোধ, হিংসা, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা ও অন্যান্য অকুশল ধর্ম দূরীভূত হয়ে যাবে। সে তখন মানুষ হিসেবে সমাজে মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান লাভ করতে সক্ষম হবে। এভাবে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে মানুষ তার ভেতরের

পশুস্বভাবকে দমন করতে পারে। আর মনুষ্য স্বভাবকে চর্চা ও উন্নত করে তার দেবস্বভাব অর্জন করতে সক্ষম হবে।

এ দেবসত্তা অর্জন করার জন্য প্রত্যেককে সর্বজনীন মৈত্রী, অন্যের সেবা করা, করুণা, অন্যের উন্নতিতে সমসুখী হওয়া এবং লাভ-ক্ষতি কিংবা নিন্দা-প্রশংসা শুনে অবিচলিত থাকার গুণাবলি অর্জন করতে হবে। এসব গুণ অর্জন করতে পারলে তাকে কোনো দুঃখ স্পর্শ করতে পারবে না।

মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য বুদ্ধ বিভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন। সেগুলোর একটি হলো ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা; অর্থাৎ মধ্যপথ অনুসরণ করা। মধ্যপথের অর্থ হলো নিজের লক্ষ্য অর্জনে বেশি ভোগ-বিলাসী না হওয়া; একই সঙ্গে নিজের শরীরকেও বেশি কষ্ট না দেওয়া। বুদ্ধের শিক্ষা অনুসারে, মধ্যপথ অনুসরণ করে তিন উপায়ে সুখ লাভ সম্ভব হয়— ইহ জীবনে বেঁচে থাকার জন্য সুখ অর্জন, পরজন্মে সুখ অর্জন এবং অন্তিমে নির্বাণ সুখ অর্জন। এ তিন ধরনের সুখ অর্জনের মাধ্যমে যে কেউ তার জীবনে মর্যাদা ও মহত্ত্ব লাভ করতে পারে।

৫. উপসংহার

বুদ্ধ মানুষের দুঃখমুক্তির জন্য তাঁর শিক্ষা আজীবন প্রচার করে গেছেন। বুদ্ধ বলেছেন, মানুষ মাত্রই দুঃখ ভোগ করে। জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবাই জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ ও মানসিক অশান্তি, হতাশা, অস্থিরতা ইত্যাদি দুঃখ থেকে মুক্ত নয়। এসব দুঃখ থেকে মুক্ত হতে তিনি শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো ভালো, সুখী ও প্রজ্ঞাবান মানুষ হওয়া। এর জন্য ব্যক্তিগত জীবনে পাঁচটি নীতি অনুসরণ করা। যথা- হত্যা, চুরি, মিথ্যা বলা, নারী-পুরুষের মধ্যে অসদাচার ও মাদকাসক্তি থেকে বিরত থাকা। পঞ্চশীল পালন করলে মানুষের কায়িক ও বাক্য সংযম তৈরি হয়। ভাবনার মাধ্যমে মনোসংযম তৈরি হয়। কায়িক, বাচনিক ও মনো সংযমের মাধ্যমে নিজের জীবন যেমন সুন্দর হয়, তেমনি সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, সৌহার্দ্য ও সুসম্পর্ক তৈরি হয়। এতে সমাজে সুখ, শান্তি, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জিত হয়।

বুদ্ধ বলেছেন, সমাজের বড় শত্রু হলো লোভ, দ্বেষ ও মোহ (অজ্ঞতা)। এ তিনটি শত্রু থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বুদ্ধ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা নীতি অনুশীলনের উপদেশ দিয়েছেন। মৈত্রী অনুশীলনের মাধ্যমে সবার জন্য কল্যাণ ও সুখ কামনা করা হয়; দান বা সহযোগিতার মাধ্যমেও মৈত্রী চর্চা হয়। 'সব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্তু' — জগতে সবাই সুখী হোক এ মৈত্রী ভাবনার মাধ্যমে মানুষসহ সকল জীবের প্রতি কল্যাণ কামনা করা হয়। দ্বেষের প্রতিষেধক হলো করুণা। করুণা চর্চার মাধ্যমে মানুষ পরস্পরের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য সহায়তা করে। মুদিতা অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষ নিজের মন থেকে ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা ত্যাগ করে পরস্পরের সুখ-দুঃখে ভাগীদার হয়। উপেক্ষা নীতি অনুশীলনের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। তখন তার মনে লোভ, দ্বেষ বা কোনো কলুষতা থাকে না। প্রজ্ঞাবান মানুষ যেমন নিজে দুঃখমুক্তি লাভ করেন, তেমনি অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাকে দুঃখমুক্তির পথ দেখিয়ে দিতে পারেন।

বৌদ্ধধর্মমতে, মানুষ ও পশুর মধ্যে একটা পার্থক্য হলো- মানুষের মন আছে, যেটা পশুর নেই। মন আছে বলে মানুষ চিন্তা করতে পারে, ভালো-মন্দ পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। মানুষ নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তার আচরণ সংযত করতে পারে। মনের মধ্যে নৈতিক লজ্জা (হিরি) ও নৈতিক ভয় (অত্তপা) থাকলে মানুষ মাদকাসক্তি, নেশা, লোভ-লালসা, ক্রোধ, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, ঘৃণা ইত্যাদি খারাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব, সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা বজায় থাকে। এতে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা হয়।

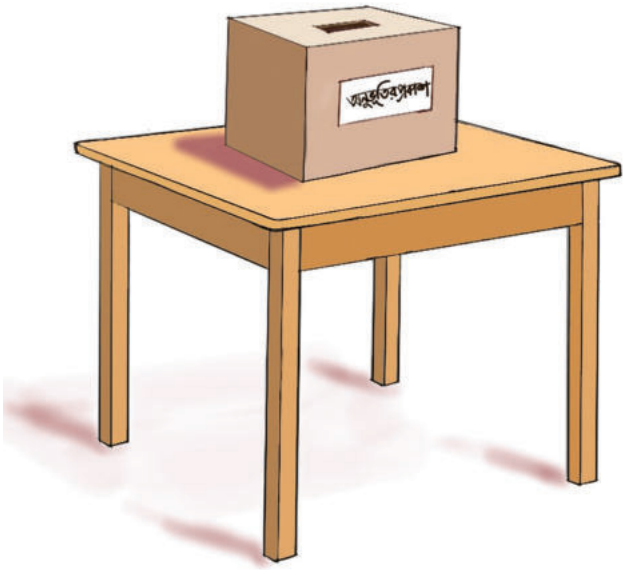

নিজের অনুভূতি প্রকাশের বাক্স

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৮

সহমর্মিতা সম্পর্কে কোন ধর্মে কী বলা হয়েছে তা সংক্ষেপে লেখো।

বৌদ্ধধর্ম	
ইসলামধর্ম	
হিন্দুধর্ম	
খ্রিষ্টধর্ম	
অন্যান্য ধর্ম	

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ২৯

চলো সবাই মিলে বিদ্যালয়ের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে 'একাত্মতা কর্নার' তৈরি করি। এক্ষেত্রে কর্নারটি তৈরি করতে কী কী প্রয়োজন তার তালিকা তৈরি করি এবং কে কোন কাজ করবে তা ভাগ করে নিই।

আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী কিছু দান করবো এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দান গ্রহণ করব।

অংশগ্রহণমূলক কাজ ৩০

'একাত্মতা কর্নার তৈরির অভিজ্ঞতাটি সম্পর্কে তোমার লিখিত মতামত দাও
কার্যক্রমের কী কী ভালো লেগেছে (ভালো দিক)?
কার্যক্রম করতে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ (প্রতিবন্ধকতাসমূহ)?
সমস্যা নিরসনে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?

ভবিষ্যতে আর কী কী উন্নয়ন করা যায় (পরামর্শ)?

** এই পৃষ্ঠায় জায়গা না হলে একটি আলাদা কাগজে লিখে কাগজটি বইয়ের পৃষ্ঠার এক পাশে আঠা দিয়ে যুক্ত করতে পারি/খাতায় লিখতে পারি।

ফিরে দেখা: নিচের তালিকার সকল কাজ কি আমরা শেষ করেছি? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ ঘরে এবং না হলে না এর ঘরে (✓) চিহ্ন দাও।

অংশগ্রহণমূলক কাজ নং	সম্পূর্ণ করেছি	
	হ্যাঁ	না

শব্দকোষ

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত

পারমী — পরিপূর্ণতা। বুদ্ধত্বলাভের জন্য জন্ম-জন্মান্তরে পারমী পূর্ণ করতে হয়।
বুদ্ধাংকুর — বোধিসত্ব পারমী।
বোধিসত্ত্ব — যার মধ্যে বোধিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে।
ব্রহ্মবিহার — মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষাকে একত্রে ব্রহ্মবিহার বলা হয়।
মার্গ — পথ, উপায়। যেমন: আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের আচরণ বিধি

অঞ্ঞমঞ্ঞ — অন্যান্য, পরস্পর।
অধিকরণসমথ — বিবাদের নিষ্পত্তি।
অধিষ্ঠান — সংকল্প, দৃঢ় সংকল্প।
অনিয়ত — আক্ষরিক অর্থ হলো অনির্ধারিত।
অপরিহানীয় — সর্বজনীন, অপরিহার্য।
ক্লিষ্টকর্ম — প্রাণীহত্যা, চুরি করা, ব্যভিচার ও মিথ্যা কথা বলা- এগুলোকে ক্লিষ্টকর্ম বলা হয়।
গৃহী বিনয় — গৃহীদের পালনীয় নীতি। যেমন: পঞ্চশীল।
চতুর প্রত্যয় — আহার, ঔষধপথ্য, বাসস্থান ও পোষকপরিচ্ছেদ (চীবর)।
দায়ক — যিনি ভিক্ষুসংঘকে চতুরপ্রত্যয় দান করে করেন।
নিসগ্গিয় — বিনয় অনুসারে নিসগ্গিয় হলো লঘু অপরাধ।
পটিদেসনিয়া — খাবার গ্রহণের নিয়ম সংক্রান্ত অপরাধ।
পাচিত্তিয় — এক প্রকার লঘু অপরাধ। যেমন: ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বললে পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।
পারাজিকা — পরাজয় বা নিয়মের গুরুতর লংঘন।
ব্রহ্মচর্য — পূর্ণ বিশুদ্ধতা বা সংযম।
ষড়দোষ — ছয়টি দোষ। যথা: নেশা করা, আমোদ-প্রমোদ, অসময়ে ভ্রমণ, কুসংসর্গ, জুয়া খেলা ও আলস্য।
সংঘাদিসেস — গুরুতর অপরাধ। কোনো ভিক্ষু এ অপরাধ করলে তাঁকে সংঘের নিয়ম অনুসারে দন্ড ভোগ করতে হয়।
সেখিয়া — শিক্ষা, প্রশিক্ষণ।

প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা

অন্তেবাসী — ছাত্র, শিষ্য।
আচার্য — শিক্ষক।
উদক সীমা — উদক অর্থ জল। উদক সীমা হলো জল দ্বারা পরিবেষ্টিত ঘর।
কর্মস্থান ভাবনা — ধ্যানের বিষয়। মনকে বশে আনার জন্য কর্মস্থান ভাবনা করা হয়।
জম্বুদ্বীপ — প্রাচীন ভারতের নাম।
প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা — আহার, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ ও ঔষধ- চারটি মৌলিক উপাদান গ্রহণ সম্পর্কে ভাবনা।

পারমী

ক্ষান্তি — ধৈর্য, ক্ষমা।
চারিত্রশীল — শ্রদ্ধা ও দৃঢ়তার সাথে ধর্মাচরণ করা ও ধর্মের নিয়মাবলী অনুসরণ করা।
থেরবাদ — বুদ্ধ কর্তৃক প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্মের নিয়ম-নীতি ও শিক্ষা। থেরবাদ হীনযান হিসেবেও পরিচিত।
নৈষ্ক্রম্য — বন্ধন ত্যাগ, জাগতিক ভোগ বিলাস ত্যাগ করা।

প্রপঞ্চ — অলীক, মোহ, মায়া, বিভ্রান্তি, আধ্যাত্মিক উন্নতির বাধা।
বারিত্রশীল — কায়িক ও বাচনিক অকুশল কর্ম থেকে বিরত থাকা। যেমন: প্রাণিহত্যা ও মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি।
মরীচিকা — ধোঁকা, ছলচাতুরি।
মহাযান — বৌদ্ধধর্মের দুটি ধারার মধ্যে একটি। এ ধারার অনুসারীরা বুদ্ধ হওয়ার জন্য বোধিসত্ত্বের গুণাবলি অর্জন করতে চান।।

অভিধর্ম পিটক

অনুলোম — অনুরূপ, স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী।
অব্যাকৃতধর্ম — এমন স্বভাব যা দ্বারা শুভ এবং অশুভ দুপ্রকার কাজ করা যায়।
চিত্ত — মন, অন্তকরণ, হৃদয়।
চৈতসিক — মনোবৃত্তি।
পটঠান — মূল কারণ।
পুগ্গল পঞ্ঞত্তি — পুগ্গল অর্থ ব্যক্তি, লোক এবং পঞ্ঞত্তি অর্থ হল ধারণা। পুগ্গল পঞ্ঞত্তি অর্থ ব্যক্তিবর্গের শ্রেণিবিভাগ।
প্রতীত্যসমুৎপাদ — কোনো কিছুকে অবলম্বন অন্য কিছুর উৎপত্তি কার্যকারণতত্ত্ব।
মাতিকা — সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত নিয়মাবলির তালিকা, ম্যাট্রিক্স।
সর্বাস্তিবাদী — সর্বাস্তি'র আক্ষরিক অর্থ হলো 'সবকিছু আছে'। অর্থাৎ সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকরা মনে করেন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত বা অনাগত এই তিন কালেই সমস্ত কিছু বিদ্যমান থাকে।

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস

অবলোকিতেশ্বর — মহাযানী বৌদ্ধধারার বিশ্বাস মতে, বোধিসত্ত্বগণের মধ্যে অন্যতম।
কর্ণসুবর্ণ — প্রাচীন বাংলার স্বাধীন গৌড় রাজা শশাংকের রাজধানী। বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথী নদীর তীরে এর অবস্থান।
চর্যাপদ — বাংলা ভাষার প্রথম রচনা। প্রাচীন বৌদ্ধ গান বা কবিতার সংকলন।
চৈত্য — মৃতের সৎকার করার স্থানে নির্মিত ঢিবি। প্রার্থনা ও শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শনের পবিত্র স্থান।
পুণ্ড্রবর্ধন — প্রাচীন যুগের উত্তরবঙ্গের একটি এলাকা, যেখানে পুণ্ড্ররা বাস করত। বর্তমান মহাস্থানগড় হলো পুণ্ড্রবর্ধন।
প্রজ্ঞাপ্ত — চালুকৃত, প্রচলনকৃত।
শীলবিপত্তি — নৈতিক চরিত্র লংঘন।
সংগীতি — বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের সমাবেশ বা সমাবর্তন।
সমতট — প্রাচীন বাংলার একটি অঞ্চল। বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তর কুমিল্লা ও বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চল নিয়ে গঠিত।

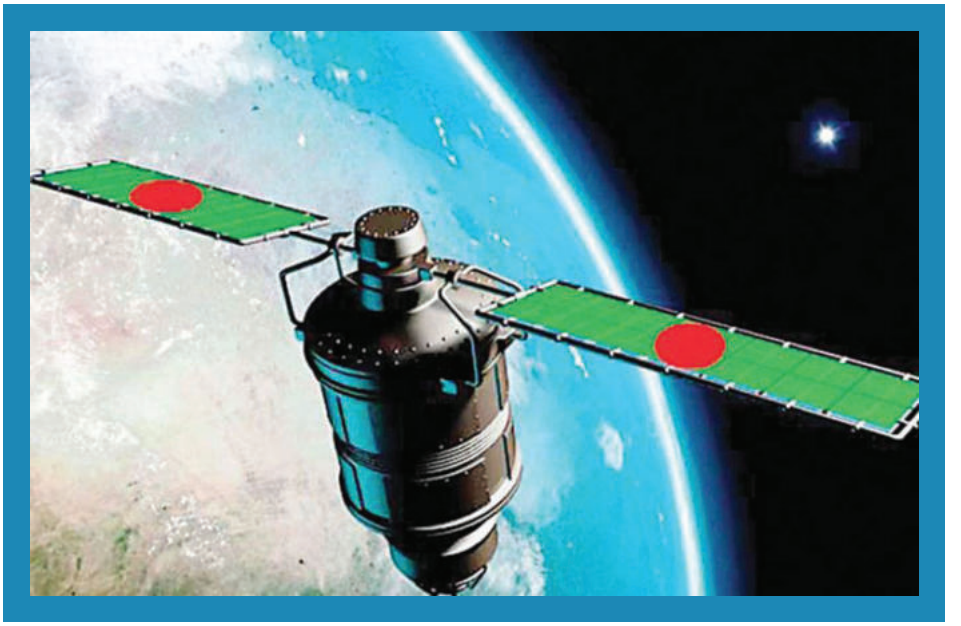

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ : বাংলাদেশের মালিকানাধীন প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ বাংলাদেশের প্রথম ভূস্থির (Geostationary) যোগাযোগ ও সম্প্রচার উপগ্রহ। এর মধ্য দিয়ে ৫৭ তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় যুক্ত হয় বাংলাদেশ। এটি ১১ই মে ২০১৮ যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। এটি ছিল ফ্যালকন ৯ ব্লক-৫ রকেটের প্রথম পেলোড উৎক্ষেপণ।

এটি ফ্রান্সের থেলিস অ্যালেনিয়া স্পেস কর্তৃক নকশা ও তৈরি করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১, ১৬০০ মেগাহার্টজ ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৪০টি কে-ইউ এবং সি-ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার বহন করছে এবং এর আয়ু ১৫ বছর। এর নির্মাণ ব্যয় প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে স্যাটেলাইটের ব্যান্ডউইথ ও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে ইন্টারনেট বঞ্চিত অঞ্চল যেমন- পার্বত্য ও হাওড় এলাকায় ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেট ও ব্যাংকিং সেবা, টেলিমেডিসিন ও দূরশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রসারেও এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। টিভি চ্যানেলগুলো তাদের সম্প্রচার সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য বিদেশি নির্ভরতা কমিয়ে এর উপর নির্ভর করছে। ফলে দেশের টাকা দেশেই থাকছে। বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মোবাইল নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়লে এর মাধ্যমে দুর্গত এলাকায় যোগাযোগ চালু রাখা সম্ভব। শুধু তাই নয় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ মহাকাশে উৎক্ষেপণেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ১৪ই জুন বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে যে স্বপ্নের বীজ বপন করেছিলেন, সেই স্বপ্ন মহীরূহে পরিণত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

স্যাটেলাইটের বাইরের অংশে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকার রঙের নকশার উপর ইংরেজিতে লেখা রয়েছে বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু-১, বাংলাদেশ সরকারের একটি মনোগ্রামও সেখানে রয়েছে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ
নবম শ্রেণি
বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

আত্ম-শরণই অনন্য শরণ
– গৌতম বুদ্ধ

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য